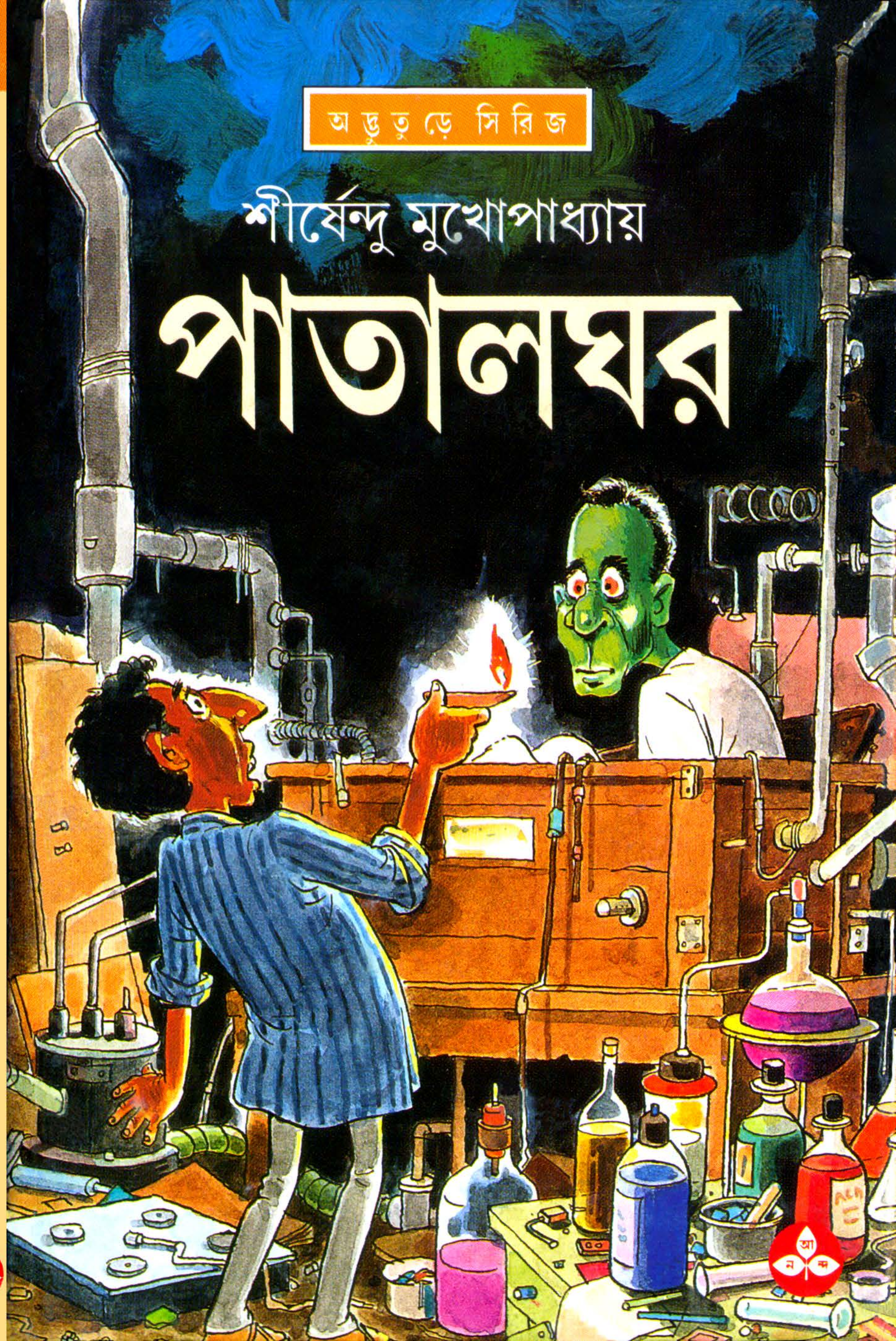


পাতালঘর • শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

পাতালঘর

পাতালঘর

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়



প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ : দেবশিস দেব



প্রথম সংস্করণ এপ্রিল ১৯৯৬
সপ্তম মুদ্রণ নভেম্বর ২০১১

ISBN 81-7215-514-X

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে সুবীরকুমার মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত এবং
বসু মুদ্রণ ১৯এ সিকদার বাগান স্ট্রিট কলকাতা ৭০০ ০০৪
থেকে মুদ্রিত।

PATALGHAR
[Juvenile Fiction]
by
Sirshendu Mukhopadhyay
Published by Ananda Publishers Private Limited
45, Beniatola Lane, Calcutta-700009

৮০.০০

"রা-স্বা"

শ্রীমতি ঈশানী মল্লিক
কল্যাণীয়াসু



"আচ্ছা, ও বাড়িতে কি ভূত আছে মশাই ?"

নরহরিবাবু অবাক হয়ে বললেন, "ভূত ! বাড়ির সঙ্গে আবার ভূতও চাই নাকি আপনার ? আচ্ছা আবদার তো মশাই ! শস্তায় বাড়িটা পাচ্ছেন, সেই ঢের, তার সঙ্গে আবার ভূত চাইলে পারব না মশাই। ভূত চাইলে অন্য বাড়ি দেখুন। ওই নরেন বক্সির বাড়ি কিনুন, মেলা ভূত পাবেন।"

সুবুদ্ধি জিভ কেটে বলল, "আরে ছিঃ ছিঃ, ভূত চাইব কেন ? ওটা কি চাইবার জিনিস ? বলছিলাম কি পুরনো বাড়ি তো, অনেক সময়ে পুরনো বাড়িতেই তাঁরা থাকেন কিনা।"

নরহরিবাবু এ-কথাটা শুনেও বিশেষ খুশি হলেন না। গম্ভীর হয়ে বললেন, "পুরনো বাড়ি হলেই ভূত থাকবে এমন কোনও কথা নেই। ভূত অত শস্তা নয়। ভূত যদি থাকত তা হলে আরও লাখদুয়েক টাকা বেশি দর হাঁকতে পারতুম। কপালটাই আমার খারাপ। কলকাতার বিখ্যাত ভূতসন্ধানী ভূতনাথ নন্দী মাত্র ছ'মাস আগে এসে প্রস্তাব দিয়েছিলেন, 'যদি ভূতের গ্যারান্টি থাকে তবে তিন লক্ষ টাকা দিতে রাজি আছি।' বুঝলেন মশাই, ভূত থাকলে এত শস্তায় মাত্র এক লাখ টাকায় বাড়িটা আপনি পেতেন না।"

সুবুদ্ধি ঘাড় নেড়ে বলল, "বুঝেছি। ভূতের দাম আছে দেখছি।"

"চড়া দাম মশাই, চড়া দাম। অথচ কপালটা খারাপ না হলে দেড়শো বছরের পুরনো বাড়িতে এক-আধটা ভূত কি থাকতে পারত না ? কিন্তু ব্যাটারা যে কোথায় হাওয়া হল কে জানে ! বোম্বাইয়ের থিওসফিক্যাল সোসাইটির কিছু আড়কাঠিও এসেছিল ভূতের বাড়ির খোঁজে। তারাও ও-বাড়ি ভাড়া নিয়ে কয়েকদিন ছিল। ভূতের গায়ের আঁশটিও দেখতে পায়নি।"

সুবুদ্ধি হঠাৎ বলল, "ভূতের গায়ে কি আঁশ থাকে নরহরিবাবু ?"

নরহরিবাবু উদাস হয়ে বললেন, "কে জানে কী থাকে ! আঁশও থাকতে পারে, বড়-বড় লোমও থাকতে পারে।"

"নরেন বক্সির বাড়ির কথা কী যেন বলছিলেন !"

নরহরিবাবু গলাটা একটু খাটো করে বললেন, "ওর বাড়িতেও ভূতফুত কিছু নেই মশাই। সব ফক্কিকারি। ভূতনাথ নন্দীকে ভজিয়ে বাড়িটা দেড় লাখ বেশি দামে গছাল। রাত্রিবেলা মেজো ছেলে গোপালকে ভূত সাজিয়ে পাঠিয়েছিল। গোপাল সাদা চাদর চাপা দিয়ে খানিক নাচানাচি করে এল উঠোনে। নাকিগলায় কথাটথাও বলেছিল। তাইতেই ভূতনাথবাবু খুব ইমপ্রেস্‌ড। খুশি হয়ে বাড়িটা কিনে ফেললেন। তবে তিনি ব্যস্ত মানুষ, বিশেষ আসেন না। বাড়িটা পড়েই থাকে।"

সুবুদ্ধি একটা স্বস্তির শ্বাস ফেলে বলল, "যাক, বাড়িটায় ভূত নেই জেনে ভারী নিশ্চিন্ত হলাম। পুরনো বাড়ি বলে একটু খুঁতখুতুনি ছিল।"

এ-কথায় নরহরিবাবু একেবারেই খুশি হলেন না। একটু যেন চটে উঠেই বললেন, "আপনি তো ভূত নেই বলে খুশি হয়েই খালাস। কিন্তু ভূত না থাকাটা কি ভাল ? যত দিন যাচ্ছে ততই

ভূতের চাহিদা বাড়ছে। চারদিকে এখন 'ভূত নেই', 'ভগবান নেই' বলে একটা হাওয়া উঠেছে। যতই হাওয়াটা জোরদার হচ্ছে ততই লোক ভূত দেখার জন্য হামলে পড়ছে। আর যতই হামলে পড়ছে ততই ভূতেরা গা-ঢাকা দিচ্ছে। তাতে লাভটা হচ্ছে কার ?"

সুবুদ্ধি একটু হতবুদ্ধি হয়ে বলল, "তা বটে !"

"আপনি তো 'তা বটে' বলেই মুখ মুছে ফেললেন, কিন্তু আমার ক্ষতিটা বিবেচনা করেছেন ? আমার এ-তল্লাটে সোয়াশো দেড়শো বছরের পুরনো আরও পাঁচখানা বাড়ি আছে। ভূত না থাকলে সেগুলোর দর উঠবে ? নোনায় ধরেছে, ঝুরঝুর করে চুনবালি খসে পড়ছে। দেওয়াল ফেটে হাঁ হয়ে তক্ষকের বাসা হয়েছে, অশ্বত্থ গাছ উঠছে, ওসব বাড়ির দামই বা কী ? ওদিকে ভূতনাথ নন্দী বলে রেখেছেন খাঁটি ভূত থাকলে তিনি প্রত্যেকটা বাড়ি আড়াই তিন লাখে কিনে নেবেন। কিন্তু কপালটাই এমন যে, কী বলব ! মতি ওঝাকে দিয়ে সবক'টা বাড়ি তন্নতন্ন করে খুঁজিয়েছি। সে মেলা মন্ত্রটন্ত্র পড়ে ভাল করে দেখে এসে বলেছে, আপনার নসিবটাই খারাপ। 'কুনো বাড়িতে ভূতটুত কুছু নাই। সব সাফা কোঠি আছে।' আমি তো আর নরেন বক্সি নই যে, ভেজাল ভূত চালিয়ে দেব ! আমি হলাম হরি ময়রার প্রপৌত্র। আমাদের বংশে কেউ কখনও দুধে জল বা রসগোল্লায় সুজি মেশায়নি। সেই বংশের ছেলে হয়ে কি আমি ভূতে ভেজাল দিতে পারি ?"

সুবুদ্ধি অত্যন্ত বুদ্ধিমানের মতো মাথা নেড়ে বলল, "তা তো বটেই।"

"তাই বলছিলাম মশাই, ভূত নেই বলে আপনার তো আনন্দই হচ্ছে, কিন্তু আমার তো তা হচ্ছে না। একেই বলে কারও পৌষ মাস, কারও সর্বনাশ।"

সুবুদ্ধি মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বলল, "যা বলেছেন !"

নরহরিবাবু কটমট করে সুবুদ্ধির দিকে চেয়ে বললেন, "তা হলে যান, গিয়ে নেই-ভূতের বাড়িতে সুখে থাকুন গে।"

সুবুদ্ধি এতক্ষণ বড় অস্বস্তি বোধ করছিল। ধমক খেয়ে পালিয়ে বাঁচল। সঙ্গে তার ভাগ্নে কার্তিক।

রাস্তায় এসে কার্তিক বলল, "মামা, ভূতের যে এত দাম তা জানতাম না তো!"

"আমিই কি জানতাম? যাক বাবা, বাড়িটায় ভূত নেই এটাই বাঁচোয়া।"

কার্তিকের বয়স বছর পনেরো। বেশ চালাক-চতুর ছেলে। বলল, "ভূত থাকলেই ভাল হত কিন্তু মামা। ভূত দেখার মজাও হত, আবার ভূতনাথবাবুকে বেশি দামে বেচেও দেওয়া যেত।"

সুবুদ্ধি নরহরিবাবুর মতোই কটমট করে কার্তিকের দিকে চেয়ে বলল, "তোরও ঘাড়ে ভূত চাপল নাকি? ওসব কথা উচ্চারণও করতে নেই।"

সুবুদ্ধি মিলিটারিতে চাকরি করত। চাকরি করতে-করতে বেশ কিছু টাকা জমে গিয়েছিল হাতে। মিলিটারিতে খাইখরচ লাগে না, পোশাকআশাকও বিশেষ লাগে না, ইউনিফর্ম তো সরকারই দেয়। দিদি ছাড়া তার তিনকুলে কেউ নেই বলে কাউকে টাকাও পাঠাতে হত না। ফলে সুবুদ্ধির হাতে বেশ কিছু টাকা জমে গেল। মিলিটারিতে রিটায়ার করিয়ে দেয় খুব তাড়াতাড়ি। রিটায়ার হয়ে সুবুদ্ধি ভাবল, এবার নির্জনে কোথাও আস্তানা গেড়ে ছোটমতো একটু দোকান করবে আর একা-একা বেশ থাকবে। এই নন্দপুরের খোঁজ মিলিটারিরই একটা লোক দিয়েছিল। বলেছিল, "হুগলি জেলায় ওরকম জায়গা আর পাবে না। জলবায়ু যেমন ভাল, তেমনই গাছপালা আছে, নদী আছে। ব্যবসা করতে চাও তো নন্দপুর হচ্ছে সবচেয়ে ভাল জায়গা। বড় গঞ্জ, মেলা

লোকজনের যাতায়াত। নন্দপুরের বাজারের খুব নাম।”

তা নন্দপুর জায়গাটা খারাপ লাগেনি সুবুদ্ধির। বাস্তবিকই জায়গাটা চমৎকার। গাঁ বলতে যা বোঝায় তাও নয়। আধা শহর, আধা গ্রাম। ব্যবসা-বাণিজ্য করতে চাইলেও বাধা নেই।

সুবুদ্ধির দিদি বসুমতীর শ্বশুরবাড়িও কাছাকাছিই, বৈঁচিতে। ঘণ্টাটাকের পথ। দিদি নন্দপুরের নাম শুনে বলল, “ওখানে একটা ভাল ইস্কুল আছে শুনেছি। কার্তিকটার তো এখানে লেখাপড়া তেমন ভাল হচ্ছে না। সারাদিন খেলে বেড়ায়। ওকে বরং ওখানেই তোর কাছে নিয়ে রাখ। তোরও একা লাগবে না, আর ওর ওপরেও নজর রাখতে পারবি।”

দিদির পাঁচ ছেলে, এক মেয়ে। কাজেই কার্তিককে ছেড়ে দিতে জামাইবাবুরও আপত্তি হল না।

কয়েকদিন হল মামা-ভাগ্নে নন্দপুরে এসে বাজারের কাছে একটা ঘর ভাড়া নিয়ে আছে। বাড়িটাও কেনা হয়ে গেল। এখন একটু মেরামত করে নিলেই হয়। যে-ঘরটায় তারা আছে সেখানেই দোকান করা যাবে। কিসের দোকান তা অবশ্য এখনও ঠিক হয়নি। কার্তিকের ইচ্ছে, একটা রেস্টুরেন্ট বা মিষ্টির দোকান খোলা হোক, সুবুদ্ধির ইচ্ছে মনোহারি বা মুদির দোকান।

নন্দপুরের নামকরা মিস্তিরি হল হরেন মিস্তিরি। একডাকে সবাই চেনে। বড্ড ব্যস্ত মানুষ। তাকে ধরাই মুশকিল। দু'দিন ঘোরাঘুরির পর তিনদিনের দিন বিকেলে বাজারের পেছন দিকে হরেন মিস্তিরির বাড়িতে তাকে পাওয়া গেল। পাকানো চেহারা, মস্ত গোঁফ, মুখখানা থম-ধরা। সব শুনে-টুনে জিজ্ঞেস করল, “কোন বাড়িটা কিনলেন ?”

“ওই যে পাঠকপাড়ায় নরহরিবাবুর বাড়ি।”

শুনে ফিচিক করে একটু হাসল হরেন, “কেনা হয়ে গেছে ?”

"আজ্ঞে।"

"ভাল, ভাল।"

ভাল, ভাল-টা এমনভাবে বলল যে, মোটেই সেটা ভাল শোনাল না সুবুদ্ধির কানে। বলল, "কেন, কোনও গোলমাল আছে নাকি ?"

"থাকুন, বুঝবেন।"

এ-কথাটাও রহস্যে ভরা। সুবুদ্ধি বলল, "একটু খোলসা করেই বলে ফেলুন না। আমি বাইরের মানুষ, সব জেনে রাখা ভাল।"

হরেন একটা শ্বাস ফেলে বলল, "জানবেন, জানবেন, তার জন্য তাড়া কিসের ? থাকতেই তো এসেছেন, থাকতে-থাকতেই জানতে পারবেন।"

সুবুদ্ধির মনে একটা খিঁচ ধরে গেল। হরেন মিস্তিরি কি কোনও গুহ্য কথা জানে ? সে বলল, "বাড়িটা একটু পুরনো।"

হরেন গলা চুলকোতে-চুলকোতে বলল, "পুরনো বললে কিছুই বলা হয় না। ও-বাড়ি একেবারে ঝুরঝুরে। তা কত নিল ?"

"এক লাখ।"

"আপনার অনেক টাকা, না ? টাকা চুলকোচ্ছিল বুঝি ?"

সুবুদ্ধি শুকনো মুখে ঢোক গিলে বলল, "ঠকে গেছি নাকি ?"

"এখন আর সেটা জেনে লাভ কী ? কিনে তো ফেলেইছেন।"

"যে আজ্ঞে।"

হরেন মিস্তিরি বলল, "ঠিক আছে, কাল আমি লোকজন নিয়ে যাব। তবে বলেই রাখছি মশাই, ও-বাড়ি মেরামত করতে বেশ খরচ হবে আপনার।"

সুবুদ্ধি দমে গিয়ে বলল, "তা কত পড়বে ?"

"আগে দেখি, তারপর হিসেব।"

নন্দপুরে এসে জায়গাটা দেখে বেশ আনন্দ হয়েছিল সুবুদ্ধির। কিন্তু আনন্দটা এখন ধীরে-ধীরে কমে যাচ্ছে। একটু উদ্বেগ হচ্ছে।

পরদিন হরেন মিস্তিরি বাড়ি মেরামত করতে গেলে একটা বিপত্তি ঘটল। হরেনের এক শাগরেদ পাঁচু কোণের ঘরের ফাটা মেঝেতে একটা আলগা চাঙড় তুলতে যেতেই মেঝে ধসে সে পাঁচ হাত গর্তের মধ্যে পড়ে গেল। হাঁটু ভাঙল, মাজায় চোট।

হরেন মিস্তিরি মাথা নেড়ে বলল, "শুরুতেই এমন অলক্ষুণে কাণ্ড মশাই, আমি এ-বাড়ি মেরামত করতে পারব না। পাঁচুই আমার বল-ভরসা। সে বসে যাওয়াতে আমার ভারী ক্ষতি হল। আর ছোঁড়াটাও বোকা। কতবার শিখিয়ে-পড়িয়ে দিলাম, ওরে ওদিকপানে তাকাসনে, তা হলেই বিপদ। তা ছোঁড়া শুনল সে-কথা? ঠিক তাকাল, আর পড়লও বিপদে।"

সুবুদ্ধি শুকনো মুখে বলল, "কোনদিকে তাকানোর কথা বলছেন?"

হরেন নরহরিবাবুর মতোই কটমট করে তাকিয়ে বলল, "সে আমি বলতে পারব না মশাই, নিজেই বুঝবেন।"

হরেন মিস্তিরি দলবল নিয়ে চলে যাওয়ার পর সুবুদ্ধি মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল, "এখন কী হবে রে কার্তিক?"

কার্তিক বিন্দুমাত্র না ঘাবড়ে বলল, "দেখো মামা, আমি বলি কি, মেরামতের দরকার নেই। একটু ঝাঁটপাট দিয়ে চলো দুটো চৌকি কিনে এনে এমনিই থাকতে শুরু করি। তারপর দু'জনে মিলে রংটং করে নেব'খন ধীরেসুস্থে।"

"বলছিস?"

"বাড়িখানা আমার দিব্যি পছন্দ হয়ে গেছে। ইচ্ছে করছে আজ থেকেই থাকি।"

তা বাড়িটা সুবুদ্ধিরও কিছু খারাপ লাগছে না। পুরনো আমলের ত্রিশ ইঞ্চি মোটা দেওয়াল, পোক্ত গঠন। তিনখানা ঘর, একখানা দরদালান আছে। পেছনে একটু বাগান, তাতে অবশ্য আগাছাই বেশি। সুবুদ্ধি আর কার্তিক বাড়িটা ঘুরেফিরে দেখল। তিন নম্বর ঘরটা ভেতর দিকে। বেশ বড় ঘর, তারই মেঝেটা এক জায়গায় বসে গেছে।

"ওরে কার্তিক, বাড়ির মেঝে যে ফোঁপরা হয়ে গেছে রে! রাত-বিরেতে আমাদের নিয়ে ধসে পড়বে না তো!"

"না মামা, না। এ-জায়গাটায় বোধ হয় গুপ্তধনটন আছে, তাই ফাঁপা।"

"তোর মাথা।"

সুবুদ্ধি মুখে রাগ দেখালেও মনে-মনে ঠিক করে ফেলল এখানে থাকাই যুক্তিযুক্ত। বাজারে যে-ঘর ভাড়া নিয়েছে সেখানে জায়গা বড় কম, বাথরুমও নেই। এখানে থাকলে সেদিকে সুবিধে।

পরদিন বাজারে গিয়ে তারা দুটো চৌকি কিনে ফেলল। তারপর জিনিসপত্র নিয়ে এসে ঘরদোর সাজিয়ে ফেলল।

কার্তিক হঠাৎ বলল, "আচ্ছা মামা, একটা জিনিস লক্ষ করেছ?"

"কী?"

"এ-পাড়াটা অন্ধদের পাড়া।"

"বলিস কী?"

"একটু আগে সামনের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলুম। দেখলুম সব লোক চোখ বুজে হাতড়ে-হাতড়ে হাঁটছে। এমনকী একটা রিকশাওলা পর্যন্ত চোখ বুজে পঁক-পঁক করে হর্ন দিতে-দিতে চলে গেল।"

"ঠিক দেখেছিস?"



"বিশ্বাস না হয় চলো, তুমিও দেখবে।"

বাইরে এসে সুবুদ্ধি দেখল, কথাটা ঠিকই, রাস্তা দিয়ে যারা যাচ্ছে কেউ চোখে দেখে না, সবাই সামনের দিকে হাত বাড়িয়ে পা ঘষটে-ঘষটে হাঁটছে। একটা লোক সাইকেলে করে গেল, তারও চোখ বোজা।

সুবুদ্ধি ফের হতবুদ্ধি হয়ে বলল, "এ কী ব্যাপার রে ? এখানে এত অন্ধ মানুষ থাকে নাকি ?"

"তাই তো দেখছি।"

"এ তো বড় ভয়ের কথা হল রে কার্তিক। নন্দপুরের এত লোক অন্ধ কেন, তার একটু খোঁজ নিতে হচ্ছে। এখানে নিশ্চয়ই কোনও খারাপ চোখের রোগের প্রকোপ আছে। শেষে যদি আমাদেরও এই দশা হয় ?"

ঠিক এমন সময় খ্যাঁচ করে একটা হাসির শব্দ হল। সুবুদ্ধি ডান দিকে ফিরে দেখল, পাশের বাড়ির বারান্দায় একটা লোক দাঁড়িয়ে তার দিকে চেয়ে হাসছে। লোকটার মাথায় টাক, মোটা গোঁফ, রোগা চেহারা। সুবুদ্ধির চোখে চোখ পড়তেই বলল, "ভায়া কি নতুন এলে নাকি ?"

"যে আজ্ঞে।"

"নতুন লোক দেখলেই বোঝা যায়, এখনও নন্দপুরের ঘাঁতঘোঁত বুঝে উঠতে পারোনি না ?"

"আজ্ঞে না !"

"বাড়িটা কিনলে বুঝি ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। আচ্ছা মশাই, এখানে কি খুব চোখের রোগ হয় ?"

লোকটা ভ্রূ কুঁচকে বলল, "চোখের রোগ ? না তো ?"

"তা হলে এত অন্ধ কোথা থেকে এল ?"

লোকটা ফের খ্যাঁচ করে হাসল, "অন্ধ কে বলল ? ওরা তো সব চোখ বুজে হাঁটছে।"

"চোখ বুজে হাঁটছে ! কেন মশাই, চোখ বুজে হাঁটছে কেন ?"

"বাঃ, আমি দাঁড়িয়ে আছি না ?"

সুবুদ্ধির বুদ্ধি গুলিয়ে গেল, সে বলল, "আপনি দাঁড়িয়ে আছেন তো কী !"

"নন্দপুরে নতুন এসেছ, বুঝতে একটু সময় লাগবে।" বলেই লোকটা ফের খ্যাঁচ করে হাসল। হাসিটা মোটেই ভাল ঠেকল না সুবুদ্ধির কাছে। সে কার্তিকের দিকে চেয়ে বলল, "কিছু বুঝছিস ?"

"না মামা।"

"আমিও না।"

তার ঘণ্টাখানেক পরেই পুরোটা না হলেও খানিকটা বুঝল সুবুদ্ধি। বাজারে আজ তার পকেটমার হল। আর ষাঁড় তাড়া করায় পড়ে গিয়ে হাঁটুতে বেশ চোট হল। আর মামা-ভাগ্নে মিলে খাবে বলে যে দুটো মাগুর মাছ কিনেছিল তা চিলে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল। কার্তিকেরও বড় কম হল না। সুবুদ্ধি বাজারে যাওয়ার পর সে ঝুল-ঝাড়ুনি দিয়ে ঘরদোর পরিষ্কার করতে গিয়ে বে-খেয়ালে একটি বোলতার বাসায় খোঁচা মারতেই গোটা চার-পাঁচ বোলতা রেগেমেগে এসে তার কপালে আর গালে হুল দিয়ে গেল। একটা কুকুর এসে নিয়ে গেল একপাটি চটি। আর কুকুরটাকে তাড়া করতে গিয়ে রাস্তায় একটা চোখ-বোজা লোকের সঙ্গে ধাক্কা লেগে চিতপটাং হতে হল।

হয়রান আর ক্লান্ত হয়ে সুবুদ্ধি যখন বাজার থেকে ফিরল তখন কার্তিক বিরস মুখে বারান্দায় বসে আছে। ভাগ্নেকে দেখে সুবুদ্ধি বলে উঠল, "আর বলিসনি, ষাঁড়ে এমন তাড়া করেছিল..."

"রাখো তোমার ষাঁড়, বোলতার হুল তো খাওনি..."

"বোলতা কোথায় লাগে ! কড়কড়ে পাঁচশো বাইশ টাকা চলে গেল পকেট থেকে..."

"আর আমার চটি ? তার কথা কে বলবে ?'

"দু-দুটো মাগুর মাছ চিলে নিয়ে গেল হাত থেকে জানিস ?"

"আর আমার যে মাথায় চোট !"

মামা-ভাগ্নে বারান্দায় পাশাপাশি বসে যখন এসব কথা বলছিল তখন আবার সেই খ্যাঁচ করে হাসির শব্দ ! পাশের বাড়ির বারান্দায় সেই গুঁফো, টেকো, রোগা লোকটা দাঁড়িয়ে বড়-বড় দাঁত বের করে হাসছে। বলল, "কী ভায়া, বড্ড যে বেজার দেখছি ! বলি হলটা কী ?"

সুবুদ্ধি মলিন মুখ করে বলল, "বড্ড বিপদ যাচ্ছে দাদা।" লোকটা ভারী আহ্লাদের হাসি হেসে বলল, "যাচ্ছে ? বাঃ বাঃ ! এবার তা হলে দেখলে তো !"

"কী দেখব ?"

"কিছু বুঝতে পারোনি ?"

"আজ্ঞে না।"

"হেঃ হেঃ, তা হলে তো তোমাকে বেশ বোকাসোকাই বলতে হয়। জলের মতো সহজ ব্যাপারটা বুঝতে পারলে না ?"

সুবুদ্ধি মাথা চুলকে বলল, "ষাঁড়ের তাড়া খেয়ে মাথাটা ভোঁ হয়ে গেছে। বুদ্ধিটা কাজ করছে না।"

"আরে বাবা, সাধে কি আমার এত নামডাক ? শুধু এ-তল্লাট নয়, গোটা পরগনা ঘুরে দেখে এসো, এ শর্মাকে সবাই একডাকে চেনে কি না !"

সুবুদ্ধি খুব বিনয়ের সঙ্গে বলল, "তা হলে আপনি একজন কেউকেটা লোকই হবেন বোধ হয় ?"

"তা বলতে পারো। আজকাল দু' পয়সা বেশ রোজগারও হচ্ছে আমার। রোজ বড় পোনা মাছ রান্না হয় আমার বাড়িতে, ভাতের পাতে ঘি না হলে আমার চলেই না, রাতে মাংস আর ক্ষীর একেবারে বাঁধা। তা কী করে এসব হয়, তা জানো ?"

সুবুদ্ধি মাথা নেড়ে বলল, "আজ্ঞে না।"

"শুনতে চাও ?"

"যে আজ্ঞে।" সুবুদ্ধি খুব বিনয়ের সঙ্গে বলল।

লোকটা মুচকি হেসে বলল, "আমি হচ্ছি বিখ্যাত অপয়া গোবিন্দ বিশ্বাস। সকালের দিকে আমার মুখখানা দেখেছ কি সর্বনাশ! ধরো বাজারে বেরোবার মুখে আমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। ব্যস, আর দেখতে হবে না। সেদিন হয় তোমার পকেটমার হবে, নয়তো পচা মাছ বা কানা বেগুন গছিয়ে দেবে ব্যাপারিরা, নয়তো ষাঁড়ে গুঁতিয়ে দেবে।"

সুবুদ্ধি চোখ গোল-গোল করে বলল, "আজ্ঞে, তাই তো হয়েছে।"

কার্তিক বলল, "আর আমার কিছু কম হয়েছে ?"

গোবিন্দ বিশ্বাস বেশ অহঙ্কারের সঙ্গে বলল, "আরে ও তো কিছু নয়, ধরো আজ তোমার একটা গুরুতর মামলার রায় বেরোবে, মামলাটার ধরো, তোমার দিকেই পাল্লা ভারী, জিতবেই কি জিতবে। বেরোবার মুখে আমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, ব্যস, মামলার রায় ঘুরে যাবেই কি যাবে।"

সুবুদ্ধি আতঙ্কিত হয়ে বলল, "বটে ?"

"গ্যারান্টি দিই ভায়া। আর সেইজন্যই তো আজকাল আমাকে হায়ার করতে মেলা দূর-দূর থেকেও লোক আসে। মোটা ফি দিয়ে নিয়ে যায়।"

সুবুদ্ধি ক্যাবলাকান্তের মতো বলল, "হায়ার করে কেন ?"

"করবে না ? ধরো তোমার কাউকে জব্দ করা দরকার। আমার কাছে এসে টাকা ফেলে তোমার শত্রুর নাম-ঠিকানা দিয়ে যাও। পরদিন সকালে ঠিক আমি তার বাড়ির সামনে গিয়ে ঘাপটি মেরে থাকব। যেই বেরোবে অমনই তার সামনে গিয়ে হাসি-হাসি মুখ করে দাঁড়িয়ে যাব। আজ অবধি একটাও ফেলিওর নেই। ফিও বাড়িয়ে দিয়েছি। ছোটখাট কাজও আজকাল হাতে নিই না। এই তো রামবাবুর সঙ্গে অবিনাশবাবুর খুব মন-কষাকষি। রামবাবুর ছেলে অবনী প্রতি বছর পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়। অবিনাশবাবু সেবার অবনীর পরীক্ষার ফল বেরোবার আগের দিন এসে আমাকে হায়ার করার জন্য ঝুলোঝুলি, যেন পরদিন সকালে অবনীকে একটু দেখা দিয়ে আসি। তা আমি রাজি হইনি। বড্ড ছোট কাজ। ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করতে আছে ? অবিনাশ তখন হাতে দু' হাজার টাকা গুঁজে দিয়ে বললেন, 'এ-কাজটা না করলে আমি আত্মহত্যা করব।' তা কী আর করা। গেলুম। অবনী ইস্কুলে যাওয়ার মুখে গিয়ে তার সামনে দাঁড়িয়ে বললুম, 'কী, রেজাল্ট জানতে যাচ্ছ ? ভাল, ভাল'।"

সুবুদ্ধি চোখ গোল করে বলল, "তারপর কী হল ?"

"বললে বিশ্বাস হবে না ভায়া, যে ছেলে অঙ্কে একশোতে একশো ছাড়া পায় না, সেই ছেলে অঙ্কে পেল আট, ইংরেজিতে একুশ, ভূগোলে এগারো, আর বাংলায় পঁচিশ।"

"বলেন কী ?"

"কী বলব ভায়া, নিজের এলেম দেখে আমি নিজেই তাজ্জব !"

"আপনি তো দাদা, সাঙ্ঘাতিক লোক !"

গোবিন্দ বিশ্বাস হঠাৎ মুখখানা গম্ভীর করে বলল, "সাঙ্ঘাতিক বটে, তবে আমার জীবনটা ভারী দুঃখের। সেই ছেলেবেলা থেকে সবাই অপয়া-অপয়া বলে পেছনে লাগত, কেউ মিশতে চাইত না !

আমার কোনও বন্ধুও ছিল না। তারপর বড় হলাম, চুঁচুড়ো আদালতে চাকরিও পেলুম, কিন্তু কপালের দোষে সবাই টের পেয়ে গেল যে আমি অপয়া। লোকে ঘেন্নাটেন্নাও করত। তারপর ধীরে-ধীরে অপয়ার কদর হতে লাগল। পয়সাকড়ি পেতে শুরু করলুম। তারপর চাকরি ছেড়ে এখন দিব্যি আছি। মুখ দেখালেই পয়সা।"

সুবুদ্ধি অবাক হয়ে বলে, "যত শুনছি তত অবাক হচ্ছি। এরকমও হয় নাকি ?"

"হয় না ? এই তো আজই সকালে আমার মুখ দেখে তোমার কেমন হেনস্থাটা হল বলো। বেশি কথা কী। বর্ধমান কর্ড লাইনে বেলমুড়ি বলে একটা স্টেশন আছে। নামটা নিয়েছ কি বিপত্তি একটা হবেই। ও-লাইনের লোকেরা নামটা উচ্চারণও করে না। বলে মাঝের গ্রাম। এমনকী হাওড়ার টিকিটবাবুরা অবধি।"

"আজ্ঞে, আমি এদিককার লোক নই, তাই ও-জায়গার নাম শুনিনি। তবে আপনার ওপর ভারী শ্রদ্ধা হচ্ছে।"

"হতেই হবে। সারা পরগনার লোক আমাকে ভয় খায়। এই যে আমার বাড়ির সামনে দিয়ে যারা যায় তারা চোখ বুজে যায় কেন এবার বুঝলে তো ?"

"আজ্ঞে খুব বুঝেছি, জলের মতো পরিষ্কার।"

"তবে কী জানো ভায়া, আমার এলেম বেলা বারোটা অবধি। তারপর আর আমার অপয়া ভাবটা থাকে না। আবার ভোর থেকে শুরু হয়। তামাম দিন অপয়া ভাবটা থাকলে আরও মেলা রোজগার করতে পারতুম।"

সুবুদ্ধি খুবই শ্রদ্ধার সঙ্গে বলল, "আপনার ওপর ভারী ভক্তি হচ্ছে আমার।"

"হবে না ? হওয়ারই কথা কিনা, ভক্তি বলো, ভয় বলো, যা

হোক একটা কিছু হলেই হল। মোদ্দা কথা, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা চলবে না। সকালবেলাটায় এই বারান্দায় এসে কেন দাঁড়িয়ে থাকি জানো ? এটা হল আমার নেট প্র্যাকটিস। লোকেরা আমাকে ঠিকমতো মান্যগণ্য করছে কিনা, যথেষ্ট খাতির দেখাচ্ছে কিনা তা লক্ষ করা। তবে আজকাল অনেকেই এ-রাস্তা ছেড়ে খালধার বা বটতলা দিয়ে ঘুরে বাজারে যায়। দিনদিন এ-রাস্তায় লোক-চলাচল কমে আসছে। তা সেটাও ভাল লক্ষণ। আমার নামডাক আরও বাড়ছে, কী বলো ?"

সুবুদ্ধি খুবই গদগদ হয়ে বলল, "তা তো বটেই !"

লোকটা খ্যাঁচ করে হেসে বলল, "দরকার হলে বোলো ভায়া, তুমি আমার কাছের লোক, কম পয়সায় কাজ উদ্ধার করে দেব। বেলা বারোটা বাজে, আমার চান-খাওয়ার সময় হল। আজ আবার ইলিশ মাছ হয়েছে কিনা। গলদা চিংড়িও আছে। যাই তা হলে ?"

"আজ্ঞে আসুন। আলাপ করে বড় ভাল লাগল।"

গোবিন্দ বিশ্বাস ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করার পর কার্তিক বলল, "এ তো সাঙ্ঘাতিক লোক মামা ! এর পাশে থাকা কি ঠিক হবে ? তুমি বাড়ি বেচে দাও।"

সুবুদ্ধি করুণ মুখে বলল, "আমি আহাম্মক বলে কিনেছি। যারা জানে তারা এ-বাড়ি কি কস্মিনকালেও কিনবে ?"

"তা হলে কী হবে ?"

"সকালের দিকটায় সাবধান থাকতে হবে। ওরে, সব জিনিসেরই ভাল আর মন্দ দুটো দিক আছে। মাছের যেমন কাঁটা বেছে খেতে হয়, এও তেমনই। গোবিন্দ বিশ্বাসের মুখখানা বেলা বারোটার আগে না দেখলেই হল।"

"সকালবেলায় আমাকে ইস্কুলে যেতে হবে। তোমাকেও

বাজারহাট করতে হবে।"

"আমরাও চোখ বুজে বেরোব।"

"পারব ?"

"অভ্যাস করলে সব পারা যায়।"

কার্তিক হঠাৎ বলল, "আচ্ছা মামা, পুরনো বাড়িতে তো অনেক সময় গুপ্তধন থাকে, তাই না ?"

"তা থাকে হয়তো।"

"এ-বাড়িতেও যদি থাকে ?"

"দুর পাগলা।" বলে সুবুদ্ধি খুব হাসল।



নন্দপুরের বিখ্যাত তার্কিক হল দ্বিজপদ ভট্‌চায। হেন বিষয় নেই যা নিয়ে সে তর্ক জুড়ে দিতে না পারে। সকালবেলায় হয়তো অম্বুজবাবুর সঙ্গে ভগবান নিয়ে তর্ক বাধিয়ে প্রমাণ করেই ছাড়ল যে, ভগবান টগবান বলে কিছু নেই। যারা ভগবান মানে তারা গাধা। বিকেলে আবার ব্যোমকেশবাবুর সঙ্গে তর্কে বসে গিয়ে প্রমাণ করে দিল, ভগবান না থেকেই পারেন না। যারা বলে ভগবান নেই তারা মর্কট। এই তো সেদিন ভূগোল-সার নবীনবাবুকে বাজারের রাস্তায় পাকড়াও করে বলল, "মশাই, আপনি নাকি ক্লাসে শেখাচ্ছেন যে, আকাশের রং নীল ?"

নবীনবাবু গম্ভীর হয়ে বললেন, "তা নীল হলে নীলকে আর কী বলা যাবে ?"

দ্বিজপদ চোখ পাকিয়ে বলল, "নীলটা তো ভ্রম। আসলে

আকাশ ঘোর কালো।"

নবীনবাবু রেগে গিয়ে বললেন, "কালো বললেই হল ?" ব্যস, তুমুল তর্ক বেধে গেল। সে এমন তর্ক, যে নবীনমাস্টারের স্কুল কামাই। দাবাড়ু বিশু ঘোষকে দাবার চাল নিয়ে তর্কে হারিয়ে দিয়ে এল এই তো সেদিন।

দ্বিজপদর তর্কের এমনই নেশা যে চেনা লোক না পেলে অচেনা লোকের সঙ্গেই এটা-ওটা-সেটা নিয়ে তর্ক বাধিয়ে বসে। তর্কে দ্বিজপদর প্রতিভা দেখে ইদানীং তাকে লোক একটু এড়িয়েই চলে। হরকালীবাবু বাগান পরিষ্কার করছিলেন, দ্বিজপদ গিয়ে তাঁকে বলল, "আচ্ছা, বলুন তো মশাই, কোন আহাম্মকে বলে যে সূর্য পুব দিকে ওঠে, আর পশ্চিমে অস্ত যায় ?"

হরকালীবাবু ভয় খেয়ে বললেন, "বলে নাকি ? খুব অন্যায় কথা। বলাটা মোটেই উচিত নয়।"

সঙ্গে-সঙ্গে দ্বিজপদ কথাটার মোড় ঘুরিয়ে নিয়ে বলল, "আহা, বলবে নাই-বা কেন, বলুন তো ! বললে ভুলটা হচ্ছে কোথায় ?"

হরকালীবাবু সঙ্গে-সঙ্গে সায় দিয়ে বললেন, "না, ভুল তো হচ্ছে না। সত্যিই তো, ভুল কেন হবে ?"

তর্কের আশা নেই দেখে দ্বিজপদ কটমট করে হরকালীবাবুর দিকে তাকিয়ে বলল, "আপনি আমার সঙ্গে একমত হচ্ছেন কেন ?"

হরকালীবাবু সঙ্গে-সঙ্গে বললেন, "না, একমত হওয়াটা মোটেই কাজের কথা নয়।"

নন্দপুরের লোকেরা বেশিরভাগই আজকাল তর্কের ভয়ে দ্বিজপদর সঙ্গে একমত হয়ে যায়। ফলে দ্বিজপদর মনে সুখ নেই। গাঁয়ে নতুন লোকও বিশেষ একটা পাওয়া যায় না। সে শুনেছে কলকাতার বিখ্যাত ভূত-বিশেষজ্ঞ ভূতনাথ নন্দী নন্দপুরে

নরেন বক্সির একটা ভুতুড়ে বাড়ি কিনেছেন। মাঝে-মাঝে এসে থাকেন এবং ভূত নিয়ে গবেষণা করেন। শুনে ইস্তক দ্বিজপদ প্রায়ই বাড়িটায় এসে ভূতনাথ নন্দীর নাগাল পাওয়ার চেষ্টা করে। ভূতনাথকে পেলে তাঁর সঙ্গে ভূত নিয়ে একটা ঘোর তর্ক বাধিয়ে তোলার ইচ্ছে আছে তার।

আজও অভ্যাসবশে বিকেলের দিকে দ্বিজপদ হাঁটতে-হাঁটতে ভূতনাথ নন্দীর নতুন কেনা পুরনো বাড়িটায় হানা দিল। পশ্চিমপাড়ায় খুব নির্জন জায়গায় মস্ত বাঁশঝাড়ের পেছনে ভূতনাথের বাড়ি। ঝুরঝুরে পুরনো। পেছনে একটা মজা পুকুর। দিনের বেলাতেই এলাকাটা যেন ছমছম করে। দুটো মস্ত বাঁশঝাড়ের ভেতর দিয়ে একটা শুঁড়িপথ গেছে। সেই পথটাও আগাছায় ভরা। দ্বিজপদ পথটা পেরিয়ে বাড়ির চৌহদ্দিতে ঢুকে একটু গলা তুলে বলল, "ভূতনাথবাবু আছেন কি ? ভূতনাথবাবু !"

সাড়া পাওয়া গেল না। দ্বিজপদ হতাশ হয়ে ফিরতে যাচ্ছিল, হঠাৎ তাকে চমকে দিয়ে বাড়ির দেওয়ালের আড়াল থেকে একটা মুশকোমতো রাগী চেহারার লোক বেরিয়ে এসে গম্ভীর গলায় বলল, "কাকে খুঁজছেন ?"

খুশি হয়ে দ্বিজপদ বলল, "নমস্কার। আপনি কি ভূতনাথবাবু ?"

লোকটা তার দিকে স্থির চোখে চেয়ে বলল, "না। এ-বাড়িটা কার ?"

"কেন, ভূতনাথবাবুর ! তিনি নরেন বক্সির কাছ থেকে বাড়িটা কিনেছেন।"

"অ। তা হলে অঘোর সেনের বাড়িটা কোথায় ?"

দ্বিজপদ একটু অবাক হয়ে বলল, "অঘোর সেন ? না মশাই, ও নামে কাউকে চিনি না। অঘোর চক্রবর্তী আছেন একজন।

বামুনপাড়ায়। আর অঘোর সামন্ত থাকেন কালীবাড়ির পেছনে। আপনার ভুল হচ্ছে।"

লোকটা মাথা নেড়ে বলল, "ভুল হচ্ছে না। এ-জায়গাটা যদি নন্দপুর হয়ে থাকে, তা হলে এখানেই অঘোর সেনের বাড়ি।"

সামান্য একটু তর্কের গন্ধ পেয়ে দ্বিজপদ হাসল, "নন্দপুর হলেই সেখানে অঘোর সেন বলে কেউ থাকবে এমন কথা নেই। আর নন্দপুরের কথা বলছেন ? সারা পশ্চিমবঙ্গ খুঁজলে না হোক পঁচিশ ত্রিশটা নন্দপুর পাবেন। উত্তরপ্রদেশ, বিহার, হরিয়ানাতেও মেলা নন্দপুর আছে। আপনি কি বলতে চান সব নন্দপুরেই একজন করে অঘোর সেন আছেন ? তা বলে আমি বলছি না যে অঘোর সেন বলে কেউ নেই। খুঁজলে হয়তো বেশ কয়েকশো অঘোর সেন পাওয়া যাবে। কিন্তু তা বলে তাঁরা যে নন্দপুরেই থাকবেন এমন কোনও কথা আছে কি ?"

লোকটা বড্ডই বেরসিক। তর্কে নামার এমন একটা সুযোগ পেয়েও নামল না। তেমনই মোটা আর গম্ভীর গলায় বলল, "অঘোর সেনকে নয়, আমি তাঁর বাড়িটা খুঁজছি। অঘোর সেন বহুকাল আগেই মারা গেছেন।"

"অ। কিন্তু অঘোর সেনের বাড়ি খুঁজতে আপনি যদি ভূতনাথবাবুর বাড়িতে ঘোরাঘুরি করেন তা হলে তো লাভ নেই। অঘোর সেনের বাড়ি খুঁজতে হলে অঘোর সেনের বাড়িতেই যেতে হবে। তাই বলছিলাম, আপনি ভুল জায়গায় এসেছেন। এই নন্দপুরে অঘোর সেন বলে কেউ থাকেন না। অন্য নন্দপুরে খুঁজে দেখতে পারেন।"

লোকটা হঠাৎ এগিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে দ্বিজপদর জামাটা বুকের কাছে খামচে ধরে একখানা রাম-ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, "এখানেই অঘোর সেনের বাড়ি, বুঝলি ?"

ঝাঁকুনির চোটে দ্বিজপদর মাথার ভেতরটা তালগোল পাকিয়ে গেল, ঘাড়টাও উঠল মট করে। সে দু'বার কোঁক-কোঁক শব্দ করে বলে উঠল, "যে আজ্ঞে।"

"বাড়িটা কোথায় ?"

দ্বিজপদর বাঘের থাবায় ইঁদুরের মতো অবস্থা। বলল, "আজ্ঞে, এখানেই কোথাও হবে।"

লোকটা দ্বিজপদকে আর-একটা ঝাঁকুনি দিয়ে ছেড়ে দিতেই সে টাল সামলাতে না পেরে পড়ে গেল।

লোকটা রক্ত-জল-করা চোখে চেয়ে জলদগম্ভীর স্বরে বলল, "বাড়ি যা।"

পড়ে থেকেই দ্বিজপদ খুব বিনয়ের সঙ্গে বলল, "যে আজ্ঞে।"

তারপর কোনওরকমে উঠে এক দৌড়ে বাঁশবন পেরিয়ে রাস্তায় এসে পড়ল। জায়গাটা ভারী নির্জন, হাঁকডাক করলেও কেউ শুনতে পাবে না। দ্বিজপদ পিছু ফিরে একবার দেখে নিয়ে প্রায় ছুটতে-ছুটতে মোড়ের মাথায় বটকেষ্টর মনোহারি দোকানটায় এসে হাজির হল।

বটকেষ্ট তার বন্ধু মানুষ। ক্রিকেটের ভক্ত। গতকালই বটকেষ্টকে সর্বসমক্ষে ক্রিকেট ভাল না ফুটবল ভাল তাই নিয়ে তর্কে হারিয়ে দিয়েছে। বটকেষ্ট তাই দ্বিজপদকে দেখে গম্ভীর হয়ে বলল, "কী চাই ?"

দ্বিজপদ হাঁফাতে-হাঁফাতে বলল, "একটুর জন্য প্রাণে বেঁচে গেছি রে ভাই !"

বিরস মুখে বটকেষ্ট বলল, "সাপের মুখে পড়েছিলি বুঝি ? তা পারল না ঠুকে দিতে ? কুলাঙ্গার আর কাকে বলে !"

"না রে ভাই, সাপ নয়, খুনে ডাকাত। ভূতনাথ নন্দীর খোঁজে, তাঁর ভুতুড়ে বাড়িটায় গিয়েছিলুম। সেখানেই ঘাপটি মেরে ছিল।

যেতেই ক্যাঁক করে ধরল। মেরেই ফেলত, কোনওক্রমে হাত ছাড়িয়ে পালিয়ে এসেছি।”

বটকেষ্ট নিরাশ হয়ে বলল, “অপদার্থ! অপদার্থ! এসব লোকের মুখে চুনকালি দিতে হয়।”

দ্বিজপদ রেগে গিয়ে বলল, “কার মুখে চুনকালি দেওয়ার কথা বলছিস?”

বটকেষ্ট বলল, “তোর মুখে নয় রে, তোর মুখে নয়। ডাকাতটার কথাই বলছি। সে কেমন ডাকাত, যার হাত ফসকে



লোকে পালিয়ে যায় ?”

দ্বিজপদ অবাক হয়ে বলল, “তার মানে ? আমি খুন হলে বুঝি ভাল ছিল ?”

বটকেষ্ট তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে একটু মোলায়েম গলায় বলল, “সে-কথা হচ্ছে না । বলছিলাম কি, আগেকার মতো খাঁটি জিনিস আজকাল আর পাওয়াই যায় না । তখনকার ডাকাতরা খাঁটি ঘি-দুধ খেত, আস্ত পাঁঠা, আস্ত কাঁঠাল এক-একবারে উড়িয়ে দিত । ক্ষমতাও ছিল তেমনই, মাছিটিও গলে যেতে পারত না তাদের



পাল্লায় পড়লে। আর আজকালকার ডাকাতদের চেহারা দেখেছিস ? রোগা-দুবলা, উপোসি চেহারা, না আছে জোর, না আছে রোখ। এই তো গত মাসে বরুণ চাকির বাড়িতে ডাকাতি করতে এসে ডাকাতদের কী হেনস্থা ! গাঁয়ের লোক মিলে এমন মার মারলে যে, সব ভুঁয়ে গড়াগড়ি দিয়ে হাতেপায়ে ধরতে লাগল।"

দ্বিজপদ বুক ফুলিয়ে বলল, "আমার ডাকাতটা মোটেই তেমন নয়। ছ' ফুটের ওপরে লম্বা, খাম্বাজ চেহারা। ইয়া চওড়া কাঁধ, মুগুরের মতো হাত, রক্তবর্ণ চোখ।"

একটু উৎসাহিত হয়ে বটকেষ্ট বলল, "বটে ! তা তোর সব কেড়েকুড়ে নিল বুঝি ?"

দ্বিজপদ মাথা নেড়ে বলল, "সেসব নয়। লোকটা অঘোর সেন নামে কার একটা বাড়ি খুঁজছিল। তা সেই অঘোর সেনকে নিয়েই দু-চারটে কথা হয়েছে কি হয়নি, অমনই তেড়ে এসে এমন ঝাঁকুনি দিতে লাগল যে, প্রাণ যায় আর কি !"

বটকেষ্টর চোখ দু'খানা চকচক করে উঠল, "আহা, এসব তেজস্বী মানুষের অভাবেই না দেশটা ছারখারে যাচ্ছে ! এমন লোকের পায়ের ধুলো নিতে হয়।"

তেজস্বিতা আর মারকুট্টা ভাব যে এক নয়, বীরত্ব আর গুণ্ডামিতে যে তফাত আছে, এইটে নিয়ে দ্বিজপদ একটা তর্ক বাধাতে পারত। সুযোগও ছিল। কিন্তু কে জানে কেন, তার তর্কের ইচ্ছেটাই ফুটো বেলুনের মতো চুপসে গেছে।

দ্বিজপদ শুধু খাপ্পা হয়ে বলল, "ওরকম একটা জঘন্য, খুনিয়া, গুণ্ডা, তেরিয়া, অভদ্র লোক কিনা তেজস্বী ! তার আবার পায়ের ধুলোও নিতে ইচ্ছে করছে তোর ?"

বটকেষ্ট হাসি-হাসি মুখ করে বলল, "তোর কথা শুনে মনে

হচ্ছে লোকটা কল্কি অবতারও হতে পারে। আমাদের দুঃখ-কষ্ট ঘোচাতে এসেছে। কিন্তু এই অঘোর সেন লোকটা কে ?”

দ্বিজপদ একটু ঠাণ্ডা হয়ে বলল, “সেইটেই তো বলতে গিয়েছিলুম যে, নন্দপুরে অঘোর সেন বলে কেউ নেই। নন্দপুর হলেই যে সেখানে অঘোর সেন থাকবেন, এমন কথাও নেই। তা ছাড়া নন্দপুর নামে অনেক গাঁ আছে, অঘোর সেনও খুঁজলে বিস্তর পাওয়া যাবে। কথার পিঠে কথা আর কি। কিন্তু বেরসিক লোকটা এমন তেড়ে এল !”

বটকেষ্ট একটু চিন্তিত মুখ করে বলল, “অঘোর সেন বলে কেউ এখানে নেই ঠিকই, কিন্তু নামটা চেনা-চেনা ঠেকছে।”

দ্বিজপদ বিরক্ত হয়ে বলল, “তুই চিনবি কী করে ? অঘোর সেন নাকি অনেক আগেই মারা গেছেন।”

বটকেষ্ট চিন্তিত মুখেই বলল, “সেটাই স্বাভাবিক। নামটা যেন আমি কোনও পুঁথিপত্রে পেয়েছি, বা কোনও পুরনো লোকের মুখে শুনেছি। এখন ঠিক মনে করতে পারছি না। মনে হয়, অঘোর সেন একসময়ে বেশ বিখ্যাত লোক ছিলেন। এ-ব্যাপারে মিত্তিরজ্যাঠা কিছু জানতে পারেন।”

দ্বিজপদ উত্তেজিত হয়ে বলল, “কিন্তু ডাকাতটার ব্যাপারে কী করা যায় ?”

“প্রথম কথা, লোকটা ডাকাত কিনা আমরা জানি না। দ্বিতীয় কথা, খুনিও বলা যাচ্ছে না, কারণ তোকে লোকটা খুন করেনি। তিন নম্বর হল, লোকটাকে এখন ভূতনাথ নন্দীর বাড়িতে পাওয়া যাবেই এমন কথা বলা যাচ্ছে না। বুদ্ধিমান হলে এতক্ষণে তার সরে পড়ার কথা। চার নম্বর হল, লোকটার যেমন বিরাট চেহারা আর গায়ের জোর বলছিস তাতে আমরা দু’জন গিয়ে সুবিধে করতে পারব না। লোকলশকর ডেকে নিয়ে যেতে হবে। সেটা

সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। গাঁয়ে আজ লোকজন বিশেষ নেইও, কারণ বেশিরভাগই গেছে চড়কডাঙার মেলায়। ছ' নম্বর কথা হল—"

"ভুল হচ্ছে। এটা পাঁচ নম্বর হবে।"

"তা পাঁচ নম্বরই সই। পাঁচ নম্বর কথা হচ্ছে, অঘোর সেন সম্পর্কে কিছু তথ্য সংগ্রহ করা গেলে লোকটাকে জেরা করার সুবিধে হবে।"

"তুই একটা কাপুরুষ।"

"তাও বলতে পারিস, তবে কাপুরুষ হলেও আমি বুদ্ধিমান। এখন চল তো।"

বটকেষ্ট দোকান বন্ধ করে দ্বিজপদকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

সমাজ মিত্তির পুরনো আমলের লোক সন্দেহ নেই। বয়স এই সাতানব্বই পুরে আটানব্বই চলছে। এখনও বেশ শক্তসমর্থ আছেন। নন্দপুরের কায়স্থপাড়ায় নিজের বারান্দায় বসে সন্ধেবেলায় তিনি গেলাসে গোঁফ ডুবিয়ে দুধ খাচ্ছিলেন। একটু আগেই সায়ংভ্রমণে বেরিয়ে মাইল তিনেক হেঁটে এসেছেন।

বটকেষ্ট আর দ্বিজপদকে দেখে এক গাল হেসে বললেন, "গোঁফ ডুবিয়ে দুধ খেলে দুধের স্বাদ বেড়ে যায়, জানো?"

অন্য সময় হলে দ্বিজপদ গোঁফে বায়ুবাহিত জীবাণুর প্রসঙ্গ তুলত এবং গোঁফ ডুবিয়ে দুধ খাওয়া যে খুব খারাপ অভ্যাস, তাও প্রমাণ করে ছাড়ত। কিন্তু গুণ্ডাটার ঝাঁকুনি খেয়ে আজ তার মাথা তেমন কাজ করছে না, মেজাজটাও বিগড়ে আছে। সে বিরস মুখে বলল, "কারও পৌষ মাস, কারও সর্বনাশ। বলি মিত্তিরজ্যাঠা, আরাম করে তো দুধ খাচ্ছেন, এদিকে যে গাঁয়ে ডাকাত পড়েছে সে-খবর রাখেন?"

সমাজ মিত্তির সটান হয়ে বসে বললেন, "ডাকাত পড়েছে?"

"তবে আর বলছি কী?"

সমাজ মিত্তির ভারী খুশি হয়ে বললেন, "তা কার বাড়িতে পড়ল ? কী-কী নিয়ে গেল ? খুনখারাপি হয়েছে তো ! সব বেশ খোলসা করে বলো দেখি, শুনি। আহা, নন্দপুরে কতকাল ডাকাত পড়েনি ! সেই একুশ বছর আগে চৌধুরীদের বাড়িতে পড়েছিল, তারপর সব সুনসান।"

ডাকাতি যে সমাজবিরুদ্ধ ব্যাপার এবং মোটেই ভাল জিনিস নয় তা নিয়ে তর্ক করার জন্য দ্বিজপদর গলা চুলকে উঠল। কিন্তু নিজেকে কষ্টে সামাল দিল সে, আজ তর্কে সে এঁটে উঠবে না।

বটকেষ্ট বলল, "মাঝে-মাঝে ডাকাত পড়া কি দরকার বলে মনে হয় আপনার জ্যাঠামশাই ?"

"খুব দরকার হে, খুব দরকার। গাঁয়ের জীবন বড়ই নিস্তরঙ্গ বুঝলে, বড়ই নিস্তরঙ্গ ! মাঝে-মাঝে এরকম কিছু একটা হলে গা বেশ গরম হয়। শরীর, মন দুই-ই বেশ চাঙ্গা থাকে। তা বেশ গুছিয়ে বলো তো ঘটনাটা, কিছু বাদসাদ দিও না।"

দ্বিজপদ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "আমিই ডাকাতের খপ্পরে পড়েছিলুম একটু আগে। বিকেলের দিকটায় ভূতনাথবাবুর সন্ধানে তাঁর বাড়িতে গিয়েছিলুম, সেখানেই দেখা। ইয়া সাত ফুট লম্বা আর চওড়া চেহারা, পঞ্চাশ ইঞ্চি বুকের ছাতি, হাত দু'খানা যেন একজোড়া ঢেঁকি, চোখ ভাঁটার মতো বনবন করে ঘুরছে। আমাকে ধরে এমন ঝাঁকুনি দিচ্ছিল যে, আর একটু হলেই প্রাণবায়ু বেরিয়ে যেত।"

সমাজ মিত্তির ঝুঁকে বসে আহ্লাদের গলায় বললেন, "তারপর ?"

"তারপর কোনওরকমে তার হাত ছাড়িয়ে পালিয়ে এসেছি। একসময়ে ব্যায়ামট্যায়াম করতুম তো, তাই পারলুম। অন্য লোক হলে দাঁতকপাটি লেগে পড়ে থাকত।"

বটকেষ্ট চাপা গলায় বলল, "লোকটার হাইট এক ফুট বাড়িয়ে দিলি নাকি ? চওড়াটাও যেন বেশি মনে হচ্ছে।"

সমাজ মিত্তির বললেন, "বাঃ বাঃ, কিন্তু তারপর কী হল ?"

দ্বিজপদ বলল, "তারপর এখন অবধি আর কিছু হয়নি। হচ্ছে কি না তা বলতে পারব না। তবে হবে।"

সমাজ মিত্তির নাক সিঁটকে বললেন, "হোঃ, এটা একটা ঘটনা হল ? তোমাকে একটু ঝাঁকুনি দিয়েছে, তাতে কী ? একে কোন আক্কেলে ডাকাতি বলে জাহির করছ শুনি ? রগরগে কিছু হলে না হয় বোঝা যেত। তা লোকটা সেখানে করছিল কী ?"

"অঘোর সেন নামে একজনের বাড়ি খুঁজছিল।"

সমাজ মিত্তির ভারী অবাক হয়ে বললেন, "অঘোর সেন ! অঘোর সেনের বাড়ি খুঁজছিল ? কেন খুঁজছিল তা বলল ?"

"না জ্যাঠামশাই, অঘোর সেন নামে যে এ-গাঁয়ে কেউ নেই, তা বলতে গিয়েই তো বিপদটা হল।"

সমাজ মিত্তির বিরক্ত হয়ে বললেন, "অঘোর সেনের বাড়ি যে এ-গাঁয়ে নয় এ-কথা তোমাকে কে বলল ? কিছু জানো না, বোঝো না, সেদিনকার ছোকরা, ফস করে বলে ফেললে অঘোর সেনের বাড়ি এ-গাঁয়ে নয় ? সবজান্তা হয়েছ, না ?"

দ্বিজপদ ভারী থতমত খেয়ে গেল। বটকেষ্ট বলল, "আজ্ঞে, সে-কথা জানতেই আপনার কাছে আসা। লোকটা নাকি বেশ জোর দিয়েই বলছিল যে, অঘোর সেনের বাড়ি এই নন্দপুরেই !"

সমাজ মিত্তিরও বেশ জোরের সঙ্গে বললেন, "আলবাত নন্দপুরে। লোকটা ঠিকই বলেছে।"

দ্বিজপদ আমতা-আমতা করে বলল, "তিনি কে জ্যাঠামশাই ?"

"তিনি খুব সাঙ্ঘাতিক লোক ছিলেন। কিন্তু সে-কথা থাক। আগে বলো তো, ঘটনাটা যখন ঘটল তখন ভূতনাথ কী

করছিল !”

দ্বিজপদ মাথা নেড়ে বলল, “তিনি তো আসেননি !”

সমাজ মিত্তির বললেন, “আসেনি মানে ? বললেই হল আসেনি ? বেলা তিনটের সময় পালোয়ান ভৃত্য হরুয়াকে নিয়ে এই পথ দিয়েই ভূতনাথ গেছে। আমি তখন বারান্দায় বসে ছিলুম। আমাকে দেখে এগিয়ে এসে দু' দণ্ড দাঁড়িয়ে কথা বলে গেল। আসেনি মানে ?”

দ্বিজপদ একটু অবাক হয়ে বলল, “কিন্তু অনেক ডাকাডাকিতেও তিনি সাড়া দিলেন না জ্যাঠামশাই ?”

সমাজ মিত্তির টপ করে উঠে পড়লেন। বললেন, “তোমরা বোসো, আমি চট করে টর্চ আর লাঠিগাছ নিয়ে আসছি। ব্যাপারটা সুবিধের ঠেকছে না। একটু সরেজমিনে দেখতে হচ্ছে।”

দ্বিজপদ তাড়াতাড়ি বলল, “লোকজন না নিয়ে কি সেখানে যাওয়া ঠিক হবে জ্যাঠামশাই ? আমি বরং লোক ডাকতে যাই।”

বটকেষ্ট বলল, “আমার একাদশী পিসির বড্ড অসুখ, এখন-তখন অবস্থা। একবার তাঁর বাড়িতে না গেলেই নয়।”

সমাজ মিত্তির দ্বিজপদর দিকে চেয়ে বললেন, “গাঁয়ের লোক আজ প্রায় সবাই মেলায় গেছে, ডেকেও কাউকে বিশেষ পাবে না। আর ডেকে হবেটাই বা কী ? তারাও তো তোমাদের মতোই ভিতুর ডিম।”

তারপর বটকেষ্টর দিকে চেয়ে বললেন, “একাদশীর জন্য চিন্তার কিছু নেই। বিকেলে বেড়াতে বেরিয়ে আজ ন'পাড়ার দিকেই গিয়েছিলুম। দেখলুম একাদশী মস্ত যাঁতায় ডাল ভাঙছে।”

দু'জনেই একটু অপ্রস্তুত। সমাজ মিত্তির তাঁর মোটা বাঁশের লাঠি আর টর্চ নিয়ে বেরিয়ে এসে বললেন, “চলো। দেরি করা ঠিক হবে না।”

সমাজ মিত্তির আগে-আগে টর্চ ফেলতে ফেলতে আর লাঠি ঠুকতে-ঠুকতে, দ্বিজপদ আর বটকেষ্ট একটু পেছনে জড়সড় আর গা-ঘেঁষাঘেঁষি করে এগোতে লাগল।

বাঁশবনে ঘুটঘুট্টি অন্ধকার। জোনাকি জ্বলছে বলে অন্ধকারটা যেন আরও ঘন মনে হচ্ছে। মানুষের সাড়া পেয়ে দু-চারটে বন্যপ্রাণী, শেয়াল আর মেঠো ইঁদুরই হবে, দৌড়ে পালাল। জনমনিষ্যির চিহ্ন নেই।

বাঁশবন পেরিয়ে বাড়ির চাতালে পৌঁছে মিত্তিরমশাই চারদিকে টর্চ ফেললেন। বাড়িতে কোনও আলো জ্বলছে না। তবে সদর দরজাটার একটা পাল্লা হাঁ করে খোলা।

সমাজ মিত্তির হাঁক মারলেন, "ভূতনাথ! ভূতনাথ আছ নাকি?"

নির্জন ফাঁকা অন্ধকারে ডাকটা এমন বিটকেল শোনাল যে, দু'জনের পিলে চমকে গেল। সমাজ মিত্তিরের গলায় যে এত জোর, তা তাদের জানা ছিল না। যে ডাকে মড়া পর্যন্ত উঠে বসে, সেই ডাকেও ভূতনাথের সাড়া পাওয়া গেল না।

সমাজ মিত্তির দুশ্চিন্তার গলায় বললেন, "নন্দীর পো-র হল কী?"

দ্বিজপদ ভাঙা গলায় বলল, "বোধ হয় টায়ার্ড হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন। ডিস্টার্ব করাটা ঠিক হবে না জ্যাঠামশাই।"

বটকেষ্ট বলল, "ভূতনাথ নন্দীর বদলে আর কাউকে দেখেননি তো জ্যাঠামশাই? বয়স হলে তো একটু-আধটু ভুল হতেই পারে।"

সমাজ মিত্তির অবশ্য কোনও কথাই কানে তুললেন না। লাঠিটা বাগিয়ে ধরে এগোতে-এগোতে বললেন, "একটা বিপদের গন্ধ পাচ্ছি হে। এসো দেখা যাক।"

দ্বিজপদ বলে উঠল, "কাজটা কি ঠিক হচ্ছে জ্যাঠামশাই ? ট্রেসপাসিং হচ্ছে না ?"

বটকেষ্ট বলে উঠল, "কথাটা আমারও মনে হয়েছে। ট্রেসপাসিংটা মোটেই ভাল জিনিস নয়।"

বাড়ির বারান্দায় উঠে সমাজ মিত্তির আবার বাঘা গলায় ডাকলেন, "ভূতনাথ, আছ নাকি ? ভূতনাথ ?"

সেই ডাকে দুটো বাদুড় উড়ল। কয়েকটা চামচিকে চক্কর মারতে লাগল। দূরে কোথাও কুকুর ডেকে উঠল ভৌ-ভৌ করে। কিন্তু ভূতনাথ সাড়া দিলেন না।

অবশ্য সাড়া দেওয়ার মতো অবস্থাও তাঁর ছিল না। বাইরের ঘরের মেঝের ওপর তিনি পড়ে ছিলেন উপুড় হয়ে। মাথার ক্ষতস্থান থেকে রক্ত পড়ে মেঝে ভেসে যাচ্ছিল।

দৃশ্যটা টর্চের আলোয় দেখে সমাজ মিত্তির বললেন, "সর্বনাশ ! এ তো দেখছি খুন করে রেখে গেছে ভূতনাথকে !"

দু'জনে একসঙ্গে বলে উঠল, "খুন !"

সমাজ মিত্তির উত্তেজনা ভালবাসেন, ঘটনা ঘটলে খুশি হন, কিন্তু দৃশ্যটা দেখে তিনি তেমন খুশি হলেন না। হাঁটু গেড়ে বসে ভূতনাথের নাড়ি পরীক্ষা করতে লাগলেন।

দ্বিজপদ বলল, "ডেডবডি নাড়াচাড়া করাটা ঠিক হচ্ছে না জ্যাঠামশাই। পুলিশ ওতে রেগে যায়।"

বটকেষ্ট বলল, "মড়া ছুঁলে আবার চানটান করার ঝামেলা আছে। এই বয়সে কি ওসব সইবে আপনার ?"

সমাজ মিত্তির একটা শ্বাস ছেড়ে বললেন, "এখনও মরেনি। প্রাণটা আছে। ওহে, তোমরা একটু জলের জোগাড় করো দেখি। জলের ঝাপটা দিয়ে দেখা যাক জ্ঞান ফেরে কি না। তারপর বিছানায় তুলে শোওয়াতে হবে। আর দেখো, বাতিটাতি

কিছু আছে কি না।”

জল পাওয়া গেল ভূতনাথের ওয়াটারবট্‌লে। চোখে-মুখে ঝাপটা দেওয়ার পর বাস্তবিকই ভূতনাথ চোখ খুললেন। তবে চোখের দৃষ্টি ফ্যালফ্যালে। কোনও ভাষা নেই। টেবিলের ওপর মোমবাতি আর দেশলাই ছিল। বাতি জ্বালানোর পর ভূতনাথকে বিছানায় তুলে শোওয়ানো হল। ‘ফার্স্ট এইড বক্স’ও দেখা গেল ঘরে মজুত আছে। সমাজ মিত্তির ক্ষতস্থানে ওষুধ লাগিয়ে নিজের হাতেই ব্যান্ডেজ বাঁধতে-বাঁধতে বললেন, “ওহে, তোমরা হরুয়াকে খুঁজে দেখো। মনে হচ্ছে তার অবস্থাও এর চেয়ে ভাল নয়। টর্চটা নিয়ে যাও।”

বটকেষ্ট আর দ্বিজপদ সিঁটিয়ে গেলেও মুখের ওপর না করতে পারল না। দ্বিজপদর একবার ইচ্ছে হল বলে যে, হয়তো বাজারে-টাজারে গেছে, এসে যাবে। কিন্তু সেটা প্রকাশ্যে বলাটা যুক্তিযুক্ত হবে বলে মনে হল না তার।

হরুয়াকে পাওয়া গেল ভেতরদিককার উঠোনে। উঠোনে মস্ত আগাছার জঙ্গল। তার মধ্যেই পড়ে ছিল হরুয়া। কপালের বাঁ দিকে বেশ গভীর ক্ষত। তবে হরুয়াও বেঁচে আছে। তার বিশাল চেহারা, ধরাধরি করে তুলে আনা কঠিন ব্যাপার। দ্বিজপদ ওয়াটারবট্‌ল এনে তার মুখে-চোখে ঝাপটা দেওয়ার পর হরুয়া চোখ মেলল। প্রথম কিছুক্ষণ তার চোখেও ভ্যাবলা দৃষ্টি। তবে সে পালোয়ান মানুষ। কয়েক মিনিট বাদে ধীরে-ধীরে উঠে বসে বলল, “জয় বজরঙ্গবলি”।

প্রায় আধঘণ্টা পরিচর্যার পর মোটামুটি যখন কথা বলার মতো অবস্থা হল দু’জনের, তখন ভূতনাথ নন্দী শুধু বললেন, “স্ট্রেঞ্জ থিং।”

সমাজ মিত্তির গুছিয়ে বসে বললেন, “বেশ খোলসা করে বলো

তো ভায়া, বেশ বিস্তারিত বলো।"

ভূতনাথ নন্দী মাথা নেড়ে বললেন, "বিস্তারিত বলার কিছু নেই। দুপুর সোয়া তিনটে নাগাদ আমি আর হরুয়া বাড়িতে ঢুকেছি। ঢুকে দেখি দরজার তালা ভাঙা। অবাক হওয়ার ব্যাপার নয়, নির্জন জায়গায় বাড়ি, চোর হানা দিতেই পারে। তাই আমি বাড়িটাতে দামি জিনিস কিছুই রাখি না। সামান্য দুটো খাট, বিছানা, আর দু'-চারটে পুরনো অ্যালুমিনিয়ামের বাসনকোসন। যায় যাক। তাই তালা ভাঙা দেখে আমরা চেঁচামেচি, থানা-পুলিশ করিনি। হরুয়া একটু তড়পাচ্ছিল বটে, তবে সেটা ফাঁকা আওয়াজ। কিন্তু ঘরে ঢুকে দেখলুম, চোর কিছুই নেয়নি, কিন্তু দু'-দুটো ঘরের মেঝেয় বিরাট করে গর্ত খুঁড়েছে। ওই উত্তরপাশের ঘরটায় আর পেছনের ঘরটায়। দুটো গর্তই সদ্য খোঁড়া। বাড়ির মেঝে এরকম জখম হওয়ায় হরুয়া তো খুব রেগে গেল, লাঠি হাতে চারদিকটা ঘুরে দেখেও এল। আমি রেগে গেলেও জানি, পুরনো বাড়িতে গুপ্তধন থাকতে পারে এই ধারণায় অনেকে খোঁড়াখুঁড়ি করে।"

সমাজ মিত্তির গম্ভীর মুখে শুনছিলেন। বললেন, "গর্ত দুটো একটু দেখে আসতে পারি ?"

"বাধা কী ? যান, দেখে আসুন। ওরে হরুয়া, বাতিটা দেখা তো।"

সমাজ দ্বিজপদ আর বটকেষ্টকে নিয়ে গর্ত দেখলেন। দুটো গর্তই কোমরসমান হবে। অনেকটা জায়গা জুড়ে বেশ করেই গর্ত খোঁড়া হয়েছে।

সমাজ মিত্তির ফিরে এসে বললেন, "তারপর বলো ভায়া।"

"আমি বিকেলের দিকটায় জিনিসপত্র গোছগাছ করছি। হরুয়া গেছে উঠোনের জঙ্গল কাটতে। এমন সময় হঠাৎ একটা বেশ

লম্বাচওড়া লোক ঘরে ঢুকে জিজ্ঞেস করল, "এটা অঘোর সেনের বাড়ি না ?' লোকটা হঠাৎ বিনা নোটিশে হুট করে ঢুকে পড়ায় আমি বিরক্ত হয়েছিলুম। বেশ ধমক দিয়ে বললুম, 'না মশাই, এটা অঘোর সেনের বাড়ি নয়। আপনি আসুন।' লোকটা এ-কথায় রেগে গিয়ে বলল, 'এটাই অঘোর সেনের বাড়ি। তুই এখানে কী করছিস ?' আমি রেগে গেলেও মাথা ঠাণ্ডা রেখে বললুম, 'এ-বাড়ি কার, তা আমি জানি না। তবে আমি বক্সির কাছে কিনেছি।'"

"তারপর কী হল ?"

"ব্যস, কথা ওটুকুই। বাকিটা অ্যাকশন। লোকটা হঠাৎ মুগুরের মতো একটা জিনিস বের করে ধাঁই করে মাথায় মারল। আর কিছু জানি না।"

হরুয়া বলল, "আমি লোকটাকে দেখিনি। আপনমনে জঙ্গল সাফা করছিলাম, হঠাৎ কে যে কোথা থেকে কী দিয়ে মারল তা ভগবান জানেন।"

সমাজ মিত্তির একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "তোমাদের কপালে বোধ হয় আরও কষ্ট আছে, ভূতনাথ। তোমরা বরং এখানে এখন আর থেকো না।"

"কেন বলুন তো ?"

"অঘোর সেনের খোঁজ যখন শুরু হয়েছে, তখন সহজে শেষ হবে না।"

"অঘোর সেনটা কে ?"

"সে বৃত্তান্ত পরে শুনো। আজ বিশ্রাম নাও। গাঁ থেকে কয়েকজন শক্তসমর্থ লোক পাঠাচ্ছি। তারা আজ বাড়িটা পাহারা দেবে।"



গভীর রাত্রি। মামা আর ভাগ্নে পাশাপাশি দুটো চৌকিতে অঘোরে ঘুমোচ্ছিল। দু' দিন খুব খাটাখাটনি গেছে। শরীর দু'জনেরই খুব ক্লান্ত। পাড়াটা শান্ত, চুপচাপ। মাঝে-মাঝে রাতচরা পাখির ডাক, ঝিঁঝিঁর শব্দ, কখনও কুকুরের একটু ঘেউ-ঘেউ। তাতে ঘুমটা আরও গভীরই হয়েছে দু'জনের।

রাত যখন প্রায় একটা, তখন সুবুদ্ধি হঠাৎ ঘুম ভেঙে উঠে বসল। তার মনে হল, কে যেন করুণ স্বরে কাকে ডাকছে। বারবার ডাকছে, অনেকক্ষণ ধরে ডাকছে।

"কার্তিক ! ওরে কার্তিক !"

আধো-ঘুমের মধ্যেই কার্তিক বলল, "কী মামা ?"

"কে কাকে ডাকছে বল তো ! কারও বিপদ-আপদ হল নাকি ?"

"হলেই বা ! তুমি ঘুমোও।"

"ওরে না। পাঁচজনের বিপদে-আপদে দেখতে হয়। পাড়া-প্রতিবেশী নিয়ে বাস করতে গেলে অমন মুখ ঘুরিয়ে থাকলে হয় না।"

কার্তিক উঠে বসল। হাই তুলে বলল, "কোথায়, আমি তো কিছু শুনতে পাচ্ছি না !"

"কান পেতে শোন।"

কার্তিক কানখাড়া করল। কিছুক্ষণ পর বলল, "কোথায় কী ? তুমি স্বপ্ন দেখেছ।"

সুবুদ্ধিও শব্দটা আর শুনতে পাচ্ছিল না। বলল, "স্বপ্ন দেখা যায়। স্বপ্ন কি শোনা যায় রে ? আমি শব্দটা শুনেছি।"

"রাত্রিবেলা কতরকম শব্দ হয়। ঘুমোও তো।"

"উঁহু, ভুল শুনেছি বলে মনে হয় না। মিলিটারিতে ছিলাম, আমাদের অনেক কিছু শিখতে হয়েছে।"

কার্তিক শুয়ে চোখ বুজল, আর সঙ্গে-সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ল। সুবুদ্ধিও শুল। তবে তার মনটা খচখচ করছিল। একটু এপাশ-ওপাশ করে সেও শেষ অবধি ঘুমোল।

রাত দুটো নাগাদ হঠাৎ কার্তিক ধড়মড় করে উঠে বসে বলল, "মামা, ও মামা ! শব্দটা শুনেছ ?"

সুবুদ্ধি ঘুম ভেঙে বলল, "কিসের শব্দ ?"

"তোমার শব্দটাই গো ! কে কাকে ডাকছে। শোনোনি ?"

সুবুদ্ধি টর্চটা নিয়ে মশারি তুলে বেরিয়ে এল, "চল তো দেখি।"

"ও মামা, এ-বাড়িতে ভূত নেই তো !"

"দুর ! ভূত থাকলে বাড়িটা এত শস্তা হত নাকি ? ভূতের দাম শুনলি না ?"

"তাই তো !"

"কী নাম ধরে ডাকছিল বুঝতে পারলি ?"

"কার্তিক মাথা নেড়ে বলল, "না। খুব অস্পষ্ট শব্দ। তবে মনে হল কী বাবু বলে যেন ডাকছিল।"

"আমিও ওরকমই শুনেছি। ঘোষবাবু না বোসবাবু কী যেন।"

"মামা, আমার বড্ড ভয়-ভয় করছে।"

সুবুদ্ধি একটু হাসল, "ভয়টা কিসের ? মানুষ বিপদে পড়ে মানুষকে ডাকে।"

"কিন্তু তুমি টর্চ নিয়ে চললে কোথায় ? শব্দটা কোথা থেকে আসছে, কে করছে তা না জেনে হুট করে বেরিয়ে পড়লেই তো কাজ হবে না। মনে হচ্ছে শব্দটা বেশ দূর থেকে আসছে।"

সুবুদ্ধি চিন্তিত মুখে বলল, "ভাবছি পাড়াটা একটা চক্কর দিয়ে আসব। তুই বরং ঘুমিয়ে থাক, আমি বাইরে তালা দিয়ে যাচ্ছি।"

কার্তিক তড়াক করে উঠে পড়ে বলল, "পাগল নাকি ? আমি এই ভুতুড়ে বাড়িতে একা থাকতে গেছি আর কি ! চলো, আমিও সঙ্গে যাই।"

সুবুদ্ধি একটু ভেবে তার লাঠিটাও নিয়ে নিল। দরজায় তালা লাগিয়ে বেরিয়ে পড়ল দু'জনে।

রাস্তাঘাট অতীব নির্জন। রাস্তায় কুকুরটা বেড়ালটা অবধি দেখা যাচ্ছে না। আশপাশে যে দু'-চারটে বাড়ি আছে, সব অন্ধকার। সুবুদ্ধি হাঁটতে-হাঁটতে বলল, "শব্দটা কোন দিক থেকে আসছিল বল তো ?"

কার্তিক মাথা নেড়ে বলল, "বলতে পারব না। ভুলও শুনে থাকতে পারি।"

"দু'জনেই শুনেছি। ভুল বলে মনে হচ্ছে না।"

গোটা পাড়াটা ঘুরে-ঘুরে দেখল তারা। কোথাও কারও বিপদ হয়েছে বলে মনে হল না।

কার্তিক বলল, "চলো মামা, ফেরা যাক।"

সুবুদ্ধি মাথা নেড়ে বলল, "তাই চল।"

নিজেদের বাড়ির দরজায় এসে দু'জনেই থমকে দাঁড়িয়ে গেল। তালাটা ভাঙা, দরজার একটা পাল্লা হাঁ হয়ে খোলা।

কার্তিক ভয়ার্ত গলায় বলল, "মামা, এ কী ?"

সুবুদ্ধি চাপা গলায় বলল, "চুপ। শব্দ করিস না। চোর ঢুকেছে মনে হচ্ছে। শব্দ করলে পালাবে।"

কার্তিক মামার হাত চেপে ধরে বলল, "ভেতরে ঢুকো না মামা। চোর হলে তোমাকে মেরে বসবে।"

সুবুদ্ধি হাসল। বলল, "মারতে আমিও জানি। মিলিটারিতে কি ঘাস কাটতুম রে ? তুই বরং বাইরেই থাক। আমি দেখছি।"

সুবুদ্ধি ঘরে ঢুকে দেখল, ভেতরে যে হ্যারিকেনটা তারা জ্বালিয়ে গিয়েছিল, সেটা নেভানো। অন্ধকার হলেও সুবুদ্ধি ঠাহর করে বুঝল, প্রথম ঘরটায় কেউ নেই। থাকলে সুবুদ্ধির তীক্ষ্ণ কানে শ্বাসের শব্দ ধরা পড়ত। দ্বিতীয় ঘরটাতেও কেউ ছিল না। সেটা পেরিয়ে তিন নম্বর ঘরটায় ঢুকবার মুখেই সুবুদ্ধি থমকে দাঁড়াল। তার প্রখর অনুভূতি বলল, এ-ঘরে কেউ আছে। কিন্তু কে ?

অন্ধকার এবং অজানা প্রতিপক্ষ সামনে থাকলে একটু কৌশল নিতেই হয়। সুবুদ্ধি তাই সোজা ঘরটায় ঢুকল না। উবু হয়ে বসে হামাগুড়ি দিয়ে চৌকাঠটা পেরিয়ে সে আবছা দেখতে পেল, ঘরের মেঝের গর্তটার সামনে একটা বিরাট চেহারার লোক দাঁড়িয়ে আছে। সুবুদ্ধি লাঠিটা বাগিয়ে ধরে রইল, কিন্তু কিছু করল না। সে শুনতে পেল লোকটা বিড়বিড় করে বলল, "এটাই কি অঘোর সেনের বাড়ি ? এটাই কি..."

সুবুদ্ধি সাহসী হলেও হিংস্র নয়। সে ধীরে-ধীরে উঠে দাঁড়াল।

সুবুদ্ধি একটু গলাখাঁকারি দিয়ে খুব বিনয়ের সঙ্গে বলল, "আজ্ঞে না, এটা অঘোর সেন মশাইয়ের বাড়ি নয়।"

লোকটা বিদ্যুদ্বেগে ফিরে দাঁড়াল। অতবড় শরীরটা যে এমন চিতাবাঘের মতো দ্রুত নড়াচড়া করতে পারে, তা দেখে সুবুদ্ধি অবাক হল। লোকটা চাপা হিংস্র গলায় বলল, "তুই কে ?"

সুবুদ্ধি আরও বিনয়ের সঙ্গে বলল, "আমার নাম সুবুদ্ধি। সম্প্রতি এই বাড়িটা কিনেছি। কিছু যদি মনে না করেন তো বলি,



তালা ভেঙে বাড়িতে ঢোকাটা আপনার ঠিক হয়নি। চোর-ছ্যাঁচড়রাই এমন কাজ করে।”

কথাটা শেষ করেছে কি করেনি, কী যে একটা ঘটে গেল, তা সুবুদ্ধি বুঝতেই পারল না। প্রথমে তার মুখে একটা প্রবল ঘুসি মুগুরের মতো এসে পড়ল। তাতেই মাথা অন্ধকার হয়ে গেল সুবুদ্ধির। আর সেই অবস্থাতেও টের পেল কেউ তাকে দু'হাতে তুলে নিয়ে গর্তের মধ্যে ছুড়ে ফেলে দিল। তারপর সুবুদ্ধির আর জ্ঞান নেই।

সুবুদ্ধি কতক্ষণ অজ্ঞান হয়ে ছিল, তা সে বলতে পারবে না। তবে তার জ্ঞান যখন ফিরল তখন সে দুটো জিনিস টের পেল। এক, তার চারদিকে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। আর দুই হল, সে অজ্ঞান অবস্থাতেও হাঁটু মুড়ে বসে আছে।

মিলিটারিতে ছিল বলে সুবুদ্ধির সহ্যশক্তি আর সাহস দুটোই প্রচুর। গায়ের জোরও খুব কম নয়। নিজের অবস্থাটা বুঝতে তার খানিকটা সময় লাগল। চারদিকে হাতড়ে দেখল, সে একটা বেশ অপরিসর গর্তের মধ্যে সেঁধিয়ে গেছে। নীচে-ওপরে কোথাও কোনও রন্ধ্র আছে বলে মনে হচ্ছে না। তার ওপরে একটা ফুটো নিশ্চয়ই আছে, নইলে সে এখানে এসে সেঁধোয় কী করে!

সুবুদ্ধি উঠে দাঁড়িয়ে ওপর দিকটা হাতড়ে দেখল। কিছুই নাগাল পেল না। চেঁচিয়ে কার্তিককে কয়েকবার ডাকল, বুঝতে পারল ঘরের গর্তটা কেউ বুজিয়ে দিয়েছে, গলার স্বর ওপরে যাচ্ছে না।

সাহসী সুবুদ্ধির একটু ভয়-ভয় করতে লাগল। এখনই যদি কিছু করা না যায়, তা হলে এই কবরের মধ্যে অক্সিজেনের অভাবে তার মৃত্যু অনিবার্য। গর্তের ভেতরে ভ্যাপসা গরমে তার শরীর

ঘামে ভিজে যাচ্ছে।

সুবুদ্ধি ওপরে ওঠার ফিকির খুঁজতে লাগল। ওপরে ওঠা ছাড়া বেরোবার তো পথ নেই। কাজটা শক্ত নয়। গর্তটার খাঁজে-খাঁজে পা রেখে ওঠা সহজ ব্যাপার। সুবুদ্ধি চারদিকটা হাতড়ে দেখে নিল। নরম মাটি। খাঁজখোঁজও অনেক। সুবুদ্ধি একটা খাঁজে পা রেখে ভর দিয়ে উঠতে গিয়েই হড়াস করে মাটির দেওয়াল খসে ফের নীচে পড়ল। কিন্তু ধৈর্য হারালে চলবে না। নরম মাটিতে আবার একটা গভীর খাঁজ তৈরি করে নিল সে। কিন্তু মাটি বড্ডই নরম। খাঁজ ভেঙে মাটির চাপড়া খসে পড়ে গেল।

গাছের শেকড়-বাকড় থাকলে ভাল হত। কিন্তু তা নেই। বারবার চেষ্টা করতে লাগল সুবুদ্ধি, আর বারবার মাটির চাপড়া ভেঙে পড়ে যেতে লাগল। সুবুদ্ধি ঘামছে। শ্বাসের কষ্ট এখনও শুরু হয়নি। তবে হবে। তাই সে একটু ধৈর্য হারিয়ে গর্তের একটা দেওয়ালে হাত দিয়ে খুবলে বেশ বড় একটা খাঁজ তৈরি করতে লাগল। মাটি খানিকটা খুবলে আনতে গিয়েই হঠাৎ একটা কঠিন জিনিসের স্পর্শ পেল সে। মনে হল, যেন পাথর বা ওই জাতীয় কিছু। গর্তটা সে খুবলে আরও একটু বড় করে ফেলল। তারপর হাতড়ে-হাতড়ে দেখল।

প্রথমটায় পাথর বলে মনে হলেও আরও কিছু মাটি খসাবার পর দরজায় যেমন লোহার কড়া লাগানো থাকে তেমনই একটা মস্ত এবং ভারী কড়া হাতে পেল। মাটির নীচে চোর-কুঠুরি থাকা বিচিত্র নয়। অনেক সময়ে এসব চোর-কুঠুরিতে সোনা-দানা, টাকা-পয়সা পাওয়া যায়। সুবুদ্ধি কৌতূহলবশে ওপরে ওঠার চেষ্টা ছেড়ে কড়াটা নিয়ে নাড়াঘাঁটা করতে লাগল। এটা দরজাই হবে, সন্দেহ নেই। কিন্তু খোলা শক্ত। মাটি না সরালে খোলা যাবে

না।

সুবুদ্ধি একটু জিরিয়ে নিল। ঘাম ঝরে যাচ্ছে, শরীর দুর্বল লাগছে, তেষ্টা পাচ্ছে, এই অবস্থায় হঠাৎ বেশি পরিশ্রম করলে তার দম একেবারেই ফুরিয়ে যাবে। অন্ধকারে সে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। কাজ করছে আন্দাজে আন্দাজে । টর্চটা থাকলে কাজের সুবিধে হত।

সুবুদ্ধি কিছুক্ষণ জিরিয়ে ফের মাটি সরাতে লাগল। তাড়াহুড়ো করল না। ক্রমে-ক্রমে মাটি ঝরে গর্তটা যেন আরও ছোট হয়ে যাচ্ছিল। তবে সামনে ধীরে-ধীরে একটা সরু দরজার মতো জিনিস হাতড়ে-হাতড়ে বুঝতে পারল সুবুদ্ধি। একটু ধাক্কা দিয়ে দেখল। না, দরজাটা নড়ল না। আবার ধাক্কা দেওয়ার জন্য হাতটা তুলেছিল সে। হঠাৎ তার সর্বাঙ্গ যেন ভয়ে পাথর হয়ে গেল। সর্বাঙ্গে একটা হিমশীতল শিহরন। সে স্পষ্ট শুনতে পেল, মাটির তলা থেকে কে যেন ক্ষীণ কণ্ঠে ডাকছে, "অঘোরবাবু! অঘোরবাবু! কোথায় গেলেন?"

মিলিটারি সুবুদ্ধিরও যেন মাথা গুলিয়ে গেল । মাটির তলায় চোরা-কুঠুরিতে অশরীরী ছাড়া তো কারও থাকার কথা নয়। তবে কি যক বলে সত্যিই কিছু আছে? এ কি সেই যকেরই কণ্ঠস্বর ? জীবনে সুবুদ্ধি এত ভয় কখনও পায়নি। তার বুক ধড়াস-ধড়াস করছে। হাতে পায়ে খিল ধরে গেছে।

সুবুদ্ধি কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রাম নাম করল। মাটির নীচের কণ্ঠস্বর ওই একবারই ডেকে চুপ মেরে গেছে। তবে একটু আগে সে আর কার্তিক যে এই কণ্ঠস্বর শুনেছিল, তাতে সুবুদ্ধির সন্দেহ রইল না।

সুবুদ্ধি বসে-বসে ভাবল, এই গভীর গর্তের মতো জায়গায় তার মরণ এমনিতেই লেখা আছে। মরতেই যদি হয় তো আর ভয়ের

কী আছে ? দরজাটা খুললে যদি কোনও সুড়ঙ্গটুড়ঙ্গ পাওয়া যায় তো ভাল, না হলে কপালে যা আছে হবে।

সুবুদ্ধি কড়াটা ধরে এবার নিজের দিকে টানল। কিন্তু দরজাটা নড়ল না। দরজাটা কোন দিকে খুলবে, তাও বুঝতে পারছিল না সে। টানবে না ঠেলবে, সেটাও তো বোঝা দরকার। ছিটকিনি বা ওই জাতীয় কিছু আছে কি না দেখার জন্য সুবুদ্ধি দরজাটা ফের আগাপাশতলা হাতড়াতে লাগল। একেবারে দরজার মাথায় মাটির একটা টিবলি খুবলে নিতেই একটা শিকল পেয়ে গেল সুবুদ্ধি। শিকলে একটা তালাও মারা রয়েছে। সুবুদ্ধি ভাবল, বহুকালের পুরনো তালা আর শিকল হয়তো কমজোরি হয়ে এসেছে। সে হ্যাঁচকা টান মারল।

শিকল খুলল না। তাতে হার না মেনে বারবার হ্যাঁচকা টান দিতে থাকল সে। কারণ এ ছাড়া আর পথ নেই।

অন্তত বারদশেক হ্যাঁচকা টান দেওয়ার পর হঠাৎ যেন তালা লাগানোর আংটাটা একটু নড়বড়ে মনে হতে লাগল । উৎসাহের চোটে সুবুদ্ধি দ্বিগুণ জোরে হ্যাঁচকা মেরে তালা ধরে প্রায় ঝুলে পড়ল। তাতে আংটা খুলে তালাটা পটাং করে এসে সুবুদ্ধির মাথায় লেগে একটা আলু তুলে দিল।

কিছুক্ষণ মাথাটা ঝিমঝিম করল সুবুদ্ধির।' ক্ষতস্থান থেকে রক্তও পড়ছিল। সুবুদ্ধি খানিকটা মাটি নিয়ে ক্ষতস্থানে চাপা দিল। এর চেয়ে ভাল ফার্স্ট এইড এখন আর কী হতে পারে !

খুব ধীরে-ধীরে দরজাটা ঠেলল সুবুদ্ধি। বহুকালের পুরনো জং-ধরা কবজা আর এঁটেল মাটিতে আটকে যাওয়া পাল্লা সহজে খুলল না। বেশ খানিকক্ষণ ধাক্কাধাক্কি করার পর অল্প-অল্প করে দরজাটা ওপাশে সরতে লাগল। তারপর সরু একটা ফালি ফোকর উন্মোচিত হয়ে গেল সুবুদ্ধির সামনে। ভেতরে একটা বহুকালের

পুরনো সোঁদা বাতাসের গন্ধ।

সুবুদ্ধি সন্তর্পণে দরজার ফাঁকটায় দাঁড়িয়ে ভেতরের অবস্থাটা আন্দাজ করার চেষ্টা করল। সামনে কোন বিপদ অপেক্ষা করছে তার ঠিক কী ? পা বাড়িয়ে সে দেখল, সামনে মেঝে বলে কোনও জিনিস নেই। তার পা ফাঁকায় খানিকক্ষণ আঁকপাকু করে ফিরে এল। খুব চাপা একটা শিস দিল সুবুদ্ধি। শিসের শব্দটা বেশ খানিকটা দূর অবধি চলে গেল। অর্থাৎ ঘরটা ছোট নয়। সুবুদ্ধি একটা মাটির ঢেলা নিয়ে ফেলল নীচে। অন্তত দশ ফুট নীচে ঢেলাটা থপ করে পড়ল।

দশ ফুট লাফ দিয়ে নামা সুবুদ্ধির কাছে শক্ত কিছু নয়। প্যারাট্রুপারের ট্রেনিংয়ের সময় এরকম লাফ সে বহু দিয়েছে। তবে চিন্তার বিষয় হল, নীচে কী আছে তা না জেনে লাফ মারলে বিপদ হতে পারে। নীচে আসবাবপত্র, কাচের জিনিস বা পেরেক-টেরেক থাকলে বিপদের কথা। সুবুদ্ধি তাই নিচু হয়ে হাত বাড়িয়ে দেখল নীচে নামবার কোনও মই-টই কিছু আছে কি না, নেই।

সুবুদ্ধি হুট করে লাফ না দিয়ে দরজার চৌকাঠ ধরে আগে নিজের শরীরটাকে নীচে ঝুলিয়ে দিল। তারপর হাত ছেড়ে দিতেই দড়াম করে পড়ল নীচে একটা বাঁধানো জায়গায়। পড়েই অভ্যাসবশে গড়িয়ে যাওয়ায় চোট বিশেষ হল না।

খুব ধীরে-ধীরে সুবুদ্ধি উঠে দাঁড়াল, তারপর হাতড়ে-হাতড়ে দেখতে লাগল কোথায় কী আছে। সামনেই একটা টেবিলের মতো জিনিস। তাতে মেলা শিশি, বোতল, নানা আকৃতির বয়াম বা জার রাখা আছে। রবারের নলের মতো জিনিসও হাতে ঠেকল তার।

আরও একটু এগিয়ে সে আরও বড় একটা টেবিলে আরও

বড়-বড় এবং কিম্ভূত সাইজের বয়াম, শিশি আর জার ঠাহর করল। এগুলোতে কী আছে তা জানার সাহস হল না তার। তবে একটু তুলে দেখার চেষ্টা করল। বড্ড ভারী।

এর পর একটা লম্বা টানা টেবিলের ওপর রাখা কাঠের লম্বা-লম্বা বাক্স ঠাহর করল সে। এই বাক্সে গুপ্তধন থাকলেও থাকতে পারে। থেকেও অবশ্য লাভ নেই তার। এখান থেকে বেরোতে না পারলে গুপ্তধনের সঙ্গে সেও গুপ্ত এবং লুপ্ত হয়ে যাবে।

মস্ত ঘরটা ঘুরে-ঘুরে সে কিছু কোদাল আর শাবল জাতীয় জিনিসও পেল । কাজে লাগলে এগুলোই লাগতে পারে। কিন্তু আপাতত তার দরকার একটা বাতি। সে-ব্যবস্থা নেই বলেই মনে হচ্ছে। তবু সে হাল ছাড়ল না। নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে দু'খানা হাতকেই চোখের বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করে খুঁজতে লাগল। আবার প্রথম আর দ্বিতীয় টেবিল হাতড়াতে-হাতড়াতে হঠাৎ তার মনে হল, দুটো পাথর পাশাপাশি রাখা আছে। চকমকি নয় তো!

পাথর দুটো হাতে নিয়ে ঠুকবার আগে একটু ভাবল সুবুদ্ধি, মাটির নীচে এই ঘরে কী ধরনের গ্যাস জমে আছে তা জানা নেই। হঠাৎ যদি আগুন লেগে যায়, তা হলে পুড়ে মরতে হবে।

কিন্তু যা হোক একটা কিছু তো করতেই হবে। অন্ধকারটা আর সে সহ্য করতে পারছিল না। সুবুদ্ধি ঠাকুরকে স্মরণ করে ঠুক করে চকমকি ঠুকল।

ঠুকতেই এক আশ্চর্য কাণ্ড! বাঁ হাতের পাথরটা দপ করে জ্বলে উঠে একটা নীল শিখা লকলক করতে লাগল। সুবুদ্ধি 'বাপ রে' বলে পাথরটা ফেলে দিতেই সেটা নিভে গেল। এরকম কাণ্ড সুবুদ্ধি আগে কখনও দেখেনি ।

হতবুদ্ধি হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে সে ফের নিচু হয়ে

হাতড়ে-হাতড়ে পাথরটা তুলে নিল। পাথরটায় যখন আলো হয় তখন এটাকে ব্যবহার না করারও মানে হয় না।

যেস্ন ঠুকতেই যখন পাথরটা জ্বলে উঠল তখন সে চট করে চারদিকটা দেখে নিল। টেবিলের ওপর একটা পেতলের প্রদীপ রয়েছে, পাশেই একটা শিশি। শিশিতে তেল থাকার সম্ভাবনা। জ্বলন্ত পাথরটাকে টেবিলের ওপর রেখে সে সেই আলোয় শিশি থেকে প্রদীপে তেল ঢালল। তারপর জ্বলন্ত পাথর থেকে প্রদীপটা ধরিয়ে নিল। পাথরটা কিন্তু জ্বলতে-জ্বলতে দ্রুত ক্ষয়ে তারপর ফুস করে নিভে গেল, আর তার অস্তিত্বই রইল না।

প্রদীপটাই এখন তার মস্ত ভরসা। আলোটাও হচ্ছে বেশ ভাল। সাধারণ প্রদীপের আলো যেমন টিমটিম করে, এর তা নয়। বেশ সাদাটে জোরালো একটা শিখা স্থির হয়ে জ্বলছে। ষাট বা একশো ওয়াটের বাল্‌বের চেয়ে কম নয়। হতে পারে অনেকক্ষণ অন্ধকারে ছিল বলেই আলোটা এত বেশি উজ্জ্বল লাগছে তার চোখে।

ঘরখানা বেশ বড়। অন্তত কুড়ি ফুট লম্বা আর পনেরো ফুট চওড়া হবে। চারদিকে টেবিল, আর টেবিলের ওপর নানা কিম্ভূত যন্ত্রপাতি। শিশি-বোতল আর জারের অভাব নেই। একধারে লম্বা টেবিলের ওপর পরপর তিনটে কাঠের লম্বা বাক্স। বাইরে থেকে গোটা কয়েক নল বাক্সগুলোর মধ্যে কয়েকটা ফুটো দিয়ে গিয়ে ঢুকেছে। সুবুদ্ধি চারদিকে ভাল করে চেয়ে-চেয়ে দেখল। তার মনে হচ্ছিল, এটা আদ্যিকালের কোনও বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারই হবে। খুবই বিস্ময়কর ব্যাপার।

হাতলওলা পিতলের প্রদীপটা নিয়ে সে চারদিক একটু ঘুরে দেখল। ঝুল, ধুলো, মাকড়সা এই নীচের ঘরেও কিছু কম জমেনি। একধারে একটা কাচ বসানো আলমারিতে অনেক বই

সাজানো আছে। চামড়ায় বাঁধানো বইগুলোর নাম পড়া গেল না, কাচে ময়লা জমে যাওয়ায়।

হঠাৎ তার সর্বাঙ্গে হিমশীতল একটা শিহরন বয়ে গেল। কে যেন শিস দেওয়ার মতো চিকন তীব্র স্বরে ডেকে উঠল, "অঘোরবাবু! অঘোরবাবু! আপনি কোথায়?"

এত চমকে গিয়েছিল সুবুদ্ধি যে, আর একটু হলেই প্রদীপটা তার হাত থেকে পড়ে যেত। স্বরটা এত তীব্র যে, সেটা এ-ঘর থেকেই হচ্ছে বলে মনে হল তার। কিন্তু এ-ঘরে কে থাকবে? অশরীরী অবশ্য হতে পারে।

কাঁপা হাতে প্রদীপটা শক্ত করে ধরে সে ধীরে-ধীরে লম্বাটে বাক্সগুলোর দিকে এগোল। ভয় পেতে-পেতে সে ভয় পাওয়ার শেষ সীমানায় পৌঁছে গেছে। এখন যা থাকে কপালে, তাই হবে।

প্রথম বাক্সটার ডালা খুলতে গিয়েই সে টের পেল, খোলা সহজ নয়। বজ্র-আঁটুনি আছে।

সুবুদ্ধি প্রদীপটা ধরে ভাল করে বাক্সটা দেখল। বাক্সের গায়ে একটা পুরনো বিবর্ণ কাগজ সাঁটা। তার গায়ে বাংলা হরফেই কিছু লেখা আছে। সুবুদ্ধি নিচু হয়ে দেখল, পুঁথিতে যেমন থাকে তেমনই অদ্ভুত হাতের লেখায় সাবধান করা হয়েছে, "ইহা শ্বাস নিয়ামক যন্ত্র। বাক্সটি দয়া করিয়া খুলিবেন না। খুলিলে যন্ত্র বিকল হইবার সম্ভাবনা।"

দ্বিতীয় বাক্সটার গায়েও একটা বিবর্ণ কাগজ। তাতে লেখা, "ইহাতে মৎ আবিষ্কৃত অমৃতবিন্দুর সঞ্চার ঘটিতেছে। বৎসরে এক ফোঁটা মাত্র অমৃতবিন্দু দেহে প্রবেশ করিয়া তাহা সজীব রাখিবে। বাক্সটি দয়া করিয়া খুলিবেন না।"

তৃতীয় বাক্সটার গায়েও কাগজ সাঁটা। তাতে লেখা, "এই

ব্যক্তির নাম সনাতন বিশ্বাস, অদ্য ১৮৪৫ খ্রিস্ট অব্দের সেপ্টেম্বর মাসের ৩০ তারিখে ইহার বয়ঃক্রম আঠাশ বৎসর হইবেক। সনাতন অতীব দুষ্টপ্রকৃতির লোক। তাহার অখ্যাতি বিশেষ রকমের প্রবল। আমার গবেষণার জন্য ইহাকেই বাছিয়া লইয়াছি। সনাতনকে নিদ্রাভিভূত করিতে পারিলে গ্রামের মানুষ হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিবে । সনাতন অবশ্য সহজে ধরা দেয় নাই। কৌশল অবলম্বন ও প্রলোভন প্রদর্শন করিতে হইয়াছে। যে গভীর নিদ্রায় তাহাকে অভিভূত করা হইয়াছে তাহা সহজে ভাঙিবার নহে। যুগের পর যুগ কাটিয়া যাইবে, তবু নিদ্রা ভঙ্গ হইবে না। সনাতনের শ্বাসক্রিয়া ও হৃদযন্ত্রের স্পন্দনের মাত্রা অতিশয় হ্রাস করা হইয়াছে। ফলে তাহার শরীরে শোণিত চলাচল মন্দীভূত হইবে এবং ক্ষয় একপ্রকার হইবেই না। এ-ব্যাপারে আমি হিক সাহেবের পরামর্শ লইয়াছি। অমৃতবিন্দুর সঞ্চার যদি অব্যাহত থাকে তবে সনাতনের প্রাণনাশের আশঙ্কা নাই। ভবিষ্যতের মনুষ্য, যদি সনাতনের সন্ধান পাইয়া থাকেন, তাহা হইলে তড়িঘড়ি করিবেন না। বাক্সটির পাশেই ইহা খুলিবার একটি চাবি পাইবেন। বাক্সটি খুব সন্তর্পণে খুলিবেন। সনাতনকে কী অবস্থায় দেখিতে পাইবেন তাহা অনুমানের বিষয়। আমি সে-বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করিতে পারিব না। তাহার গাত্রে একটি সবুজ প্রলেপ মাখানো আছে। মুখে ও নাকে নল দেখিবেন। বাক্সটি খুলিয়া খুব সন্তর্পণে কিছুক্ষণ বায়ু চলাচল করিতে দিবেন। সনাতনের শিয়রে একটি শিশিতে একটি তরল পদার্থ রাখা আছে। শত বা শতাধিক বৎসর পর তাহা হয়তো কঠিন আকার ধারণ করিবে। শিশিটি আগুনের উপর ধরিলেই পুনরায় উহা তারল্য প্রাপ্ত হইবে। সনাতনকে হাঁ করাইয়া এই শিশি হইতে সামান্য তরল পদার্থ তাহার মুখে ঢালিয়া দিবেন। তৎপর নাকের

ও মুখের নল খুলিয়া দিবেন। অনুমান করি, সনাতন অতঃপর চক্ষু মেলিবে। জগদীশ্বরের কৃপায় যদি সত্যই সে চক্ষু মেলিয়া চাহে এবং পুনরুজ্জীবিত হয় তাহা হইলে আমার গবেষণা সার্থক হইয়াছে বলিয়া ধরিতে হইবে। কিন্তু সেই সাফল্যের আস্বাদ লাভ করিবার জন্য আমি তখন ধরাধামে থাকিব না। মহাশয়, পূর্বেই বলিয়াছি, সনাতন অতীব দুষ্ট প্রকৃতির লোক। পুনরুজ্জীবিত হইয়া সে কী আকার ও প্রকার ধারণ করিবে তাহা আমার অনুমানের অতীত। তবে তাহাকে যে সকল প্রলোভন দেখাইয়াছি তাহার ফলে সে যে আমার অনুসন্ধান করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। ঈশ্বর প্রসাদাৎ আমি তখন পরলোকে। সনাতনের বাহানা আপনাদেরই সামলাইতে হইবে। আমি শ্রীঅঘোর সেন সম্পূর্ণ সুস্থ মস্তিষ্কে এই বিবরণ দাখিল করিলাম।"

সুবুদ্ধি হতবুদ্ধি হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। কী করবে বা করা উচিত, তা প্রথমটায় বুঝতে পারল না। তবে কৌতূহল জিনিসটা বড়ই সাঙ্ঘাতিক। শত বিপদের ভয় থাকলেও কৌতূহলকে চেপে রাখা কঠিন।

চাবিটি জায়গামতোই পাওয়া গেল। সুবুদ্ধি চাবিটা নিয়ে বাক্সের গা-তালায় ঢুকিয়ে ঘুরিয়ে দিল। তারপর ধীরে-ধীরে ডালাটা তুলে ফেলল। কী দেখবে, কাকে দেখবে ভেবে ভয়ে কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে রইল সুবুদ্ধি। তারপর চোখ খুলে হাঁ করে চেয়ে রইল।

অঘোর সেন তাঁর বিবরণে যা লিখেছেন তা যদি সত্যি হয় তা হলে লোকটা দেড়শো বছরেরও বেশি ঘুমিয়ে রয়েছে এবং লোকটার বয়স একশো আটাত্তর। সেই তুলনায় সবুজ রঙের লোকটাকে নিতান্তই ছোকরা দেখাচ্ছে। একটু রোগাভোগা চেহারা ঠিকই। তবে দেড়শো বছর ধরে মাসে মাত্র এক ফোঁটা করে



অমৃতবিন্দু খেয়ে বেঁচে থাকলে রোগা হওয়ারই কথা। কিন্তু তেমন সাঙ্ঘাতিক রোগা নয়। লোকটা অঘোরে ঘুমোচ্ছে। বুকের ওঠানামা বা শ্বাস চলাচল বোঝাই যাচ্ছে না।

সুবুদ্ধিকে চমকে দিয়ে হঠাৎ লোকটা সেই অস্বাভাবিক চিকন স্বরে ডেকে উঠল, "অঘোরবাবু ! অঘোরবাবু ! আপনি কোথায় ?"

সুবুদ্ধি আর ভয় পেল না। সে ভাল করে লোকটার আপাদমস্তক দেখে নিল। না, লোকটা জেগে নেই। তবে অহরহ



অঘোরবাবু সম্পর্কে দুশ্চিন্তা রয়েছে বলে ঘুমের মধ্যেই অঘোরবাবুকে খুঁজে নিচ্ছে।

শিয়রের শিশিটা তুলে নিয়ে প্রদীপের আলোয় দেখে নিল সুবুদ্ধি। তরলটা সত্যিই জমে গেছে। শিশিটা প্রদীপের শিখার ওপর সাবধানে ধরল সুবুদ্ধি। মিনিট দুয়েকের মধ্যে তরলটা গলে গেল।

সনাতনকে হাঁ করাতে বেগ পেতে হল না। শরীরের জোড়

আর খিলগুলো বেশ আলগা হয়ে গেছে। অর্ধেকটা ওষুধ সনাতনের মুখে ঢেলে দিল সুবুদ্ধি। তারপর নাক আর মুখ থেকে নল সরিয়ে নিল।

সনাতনের জেগে উঠতে সময় লাগবে। কিন্তু এই ঘুমন্ত লোকটার গলার স্বর পাতালঘর থেকে ওপরে কী করে গিয়ে পৌঁছত সেটা একটু অনুসন্ধান করে দেখল সুবুদ্ধি। তৃতীয় আর-একটা রবারের নল থেকে একটা চোঙার মতো জিনিস বেরিয়ে বাক্সে সনাতনের মুখের সামনেই 'ফিট' করা আছে। নলের অন্য প্রান্ত একটা ড্রামের ভেতরে গিয়ে ঢুকেছে ঘরের কোণে। সেখান থেকে ফের ওপরে উঠে ঘরের ছাদের ভেতরে গিয়ে অদৃশ্য হয়েছে। এটা বোধ হয় দেড়শো বছর আগেকার একটা পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেম। হয়তো-বা অঘোর সেনেরই উর্বর মাথা থেকে বেরিয়েছিল। সনাতনের হদিস যাতে ভবিষ্যতের মানুষ জানতে পারে সেইজন্যই বোধ হয় ব্যবস্থা করে রেখে গিয়েছিলেন।

একটু আগে যে গুণ্ডা লোকটা তাকে মেরে গর্তে ফেলে দিয়েছিল সেও অঘোর সেনের বাড়িই খুঁজছিল। কথাটা মনে পড়ে যাওয়ায় সুবুদ্ধি একটু দুশ্চিন্তায় পড়ল। অঘোর সেনের পাতালঘরের খবর কি তা হলে আরও কেউ-কেউ জানে?

সনাতনের চোখের পাতা কম্পিত হতে লাগল আরও আধঘণ্টা পর, শ্বাস দ্রুততর হতে লাগল। সুবুদ্ধি নাড়ি দেখে বুঝল, নাড়ির গতিও ক্রমে বাড়ছে।

আরও ঘণ্টাখানেক বাদে সনাতন মিটমিট করে তাকাতে লাগল। প্রদীপের আলোটাও যেন ওর চোখে লাগছে।

সুবুদ্ধি সনাতনের মুখের ওপর একটু ঝুঁকে বলল, "কেমন আছেন সনাতনবাবু?"

সনাতন পটাং করে চোখ মেলে তাকে দেখেই খোলা ভুতুড়ে গলায় চেঁচিয়ে উঠল, "ভূ-ভূ-ত ! ভূ-ভূত নাকি রে তুই ? খবরদার, কাছে আসবি না। গাম... গাম... গাম... গাম..."

সুবুদ্ধি একটু লজ্জা পেল। ধুলোমাটিতে মাখা তার চেহারাখানা যে দেখনসই নয় তা তার খেয়াল ছিল না। খুব বিনয়ের সঙ্গে সে বলল, "যার নাম করতে চাইছেন তিনি গাম নন, রাম।"

সনাতন আতঙ্কের গলায় বলল, "হ্যাঁ হ্যাঁ, রামই তো ! রাম নামে ভয় খাচ্ছিস না যে বড় ? অ্যাঁ !"

"ভূত হলে তো ভয় পাব ! আমি যে ভূতই নই আজ্ঞে।"

"তবে তুই কে ?"

"আমার নাম সুবদ্ধি রায়। চিনবেন না। পরদেশি লোক।"

"ডাকাত নোস তো !"

"আজ্ঞে না। ডাকাত হতে এলেম লাগে। আমার তা নেই।"

সনাতন চোখ পিটপিট করতে-করতে বলল, "অক্ষয়বাবু কোথায় বল তো ! অক্ষয়বাবুর কাছে আমি পাঁচ হাজার টাকা পাই।"

সুবদ্ধি বুঝতে পারল, অনেকদিন ঘুমিয়ে থাকায় সনাতনের কিছু ভুলভাল হচ্ছে। ঘুমের মধ্যে অঘোরবাবুর নামটা ঠিকঠাক বললেও এখন জেগে ওঠার পর স্মৃতি কিছুটা ভ্রষ্ট হয়েছে। সুবদ্ধি মাথা চুলকে বলল, "অক্ষয়বাবু বলে কাউকে চিনি না। তবে অঘোরবাবু বলে একজন ছিলেন।"

সনাতন বলল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, অঘোরবাবুই তো ! তিনি কোথায় ?"

"তিনি এখন নেই আজ্ঞে।"

সনাতন খ্যাঁক করে উঠল, "নেই মানে ? কোন চুলোয় গেছেন ? সনাতন বিশ্বাসের জলার জমিটা কিনব সব ঠিকঠাক হয়ে আছে। সোমবার টাকা দেওয়ার কথা।"

সুবদ্ধি একটু দোটানায় পড়ে বলল, "আজ্ঞে, যতদূর জানি, সনাতন বিশ্বাস আপনারই শ্রীনাম। নিজের জমি কি নিজে কেনা যায় ? আমি অবশ্য তেমন জ্ঞানগম্যিওলা লোক নই।"

সনাতন চোখ বড়-বড় করে বলল, "আমার নাম সনাতন বিশ্বাস ! হ্যাঁ, সেরকম যেন মনে হচ্ছে। আজ এত ভুলভাল হচ্ছে কেন কে জানে ! অঘোরবাবুর ওষুধটা খেয়ে ইস্তক মাথাটা গেছে দেখছি। আচ্ছা, আমি একটা কলসির মধ্যে শুয়ে আছি কেন বল তো !'

"কলসি ! আজ্ঞে কলসির মধ্যে শোওয়া কঠিন ব্যাপার। এ হল গে যাকে বলে বাক্স। কফিনও বলতে পারেন।"

"হ্যাঁ, বাক্সই বটে। বাপের জন্মে কখনও বাক্সে শুইনি বাপ। এ নিশ্চয়ই এই বিটকেলে অঘোরবাবুর কাণ্ড। লোকটা একটা যাচ্ছেতাই।"

"যে আজ্ঞে।"

"এখন রাত কত হল বল তো !"

"তা শেষরাত্তিরই হবে মনে হয়।"

"বলিস কী ? সেই সকালবেলাটায় ওষুধ খাইয়ে ঘুম পাড়াল এর মধ্যেই শেষ রাত্তির ! আজব কাণ্ড।"

মাঝখানে যে দেড়শো বছর কেটে গেছে সেটা আর ভাঙল না সুবুদ্ধি।

"ওরে, আমাকে একটু ধরে তোল তো, শরীরটা জুত লাগছে না। মাথাটাও ঘুরছে। আরও একটু শুয়ে থাকতে পারলে হত, কিন্তু তার জো নেই। গোরুগুলোকে জাবনা দিয়ে মাঠে ছেড়ে আসতে হবে। তারপর গঞ্জে আজ আবার হাটবার। মেলা কাজ জমে আছে।"

"আজ্ঞে এই তুলছি।" বলে সুবুদ্ধি সনাতনকে ধরে তুলে

বসাল। একটু নড়বড় করলেও সনাতন বসতে পারল। চারদিকটা প্রদীপের আলোয় চেয়ে দেখে বলল, "বড্ড ধুলো ময়লা পড়েছে দেখছি ! সকালবেলাটায় তো বেশ পরিস্কার ছিল।"

"আজ্ঞে, ধুলোময়লার স্বভাবই ওই, ফাঁক পেলেই ফাঁকা জায়গায় চেপে বসে। আর ফাঁকটা অনেকটাই পেয়েছে কি না।"

সনাতন বিরক্ত হয়ে বলল, "ধরে ধরে একটু নামা তো বাপু, একটু দাঁড়িয়ে মাজাটা ছাড়াই। এই বিচ্ছিরি বাক্স থেকে বেরনোও তো ঝামেলার ব্যাপার দেখছি"

সুবদ্ধি সনাতনকে পাঁজা-কোলে তুলে নামিয়ে দাঁড় করিয়ে দিতেই সনাতন হাঁটু ভেঙে বসে পড়ল, "ও বাবা, হাঁটুতে যে জোর নেই দেখছি !'

"ভাববেন না। সব ঠিক হয়ে যাবে। দেড়শো বছরের পাল্লাটার কথাও তো ভাববেন।"

সনাতন অবাক হয়ে বলল, "দেড়শো বছর। কিসের দেড়শো বছর রে পাজি ?"

"মুখ ফসকে একটা বাজে কথা বেরিয়ে গেছে। জিরিয়ে নিন, পারবেন।"

তা পারল সনাতন। আরও আধঘণ্টা বসে থেকে, তারপর সুবুদ্ধির কাঁধে ভর দিয়ে লগবগ করতে করতে দাঁড়াল। তারপর বলল, "নাঃ, বড্ড খিদে পেয়ে গেছে। বাড়ি গিয়ে একটু পান্তা না খেলেই এখন নয়।"

"হবে, হবে। বাড়ি যাবেন সে আর বেশি কথা কী ? এটাও নিজের বাড়ি বলে ধরে নিতে পারেন। কথায় আছে বসুধৈব কুটুম্বকম।"

নাক সিঁটকে সনাতন বলল, "হুঁঃ এটা একটা বাড়ি ! অঘোর পাগলের বাড়ি হল গোলোকধাঁধা। মাথার গণ্ডগোল না থাকলে

কেউ মাটির নীচে ঘর করে ? তা ছাড়া লোকটা ভূতপ্রেত পোষে।"

"তা বটে। তা এই অঘোর সেনের খপ্পরে আপনি পড়লেন কী করে ?"

"পড়েছি কি আর সাধে ? পাঁচটি হাজার টাকা পেলে জলার জমিটা কেনা যাবে। তা অঘোরবাবু বলল, কী একটা ওষুধ খেয়ে একটু ঘুমোলে পাঁচ হাজার টাকা দেবে। তা হ্যাঁ রে, জমিটা কার তা মনে পড়ছে না কেন বল তো !"

"পড়বে। একটু ঝিমুনির ভাবটা কাটতে দিন।"

"পড়বে বলছিস ? আচ্ছা আমার বউ, ছেলে, বাপ, মা কারও নামই কেন মনে পড়ছে না বল তো ! অঘোরবাবু আমাকে কী ওষুধই যে খাওয়াল।"

"আচ্ছা সনাতনবাবু, হিক সাহেব বলে কারও কথা আপনার মনে আছে ?"

"থাকবে না কেন ? সকালে তো এই ঘরেই দেখেছি। তোকে চুপি-চুপি বলে রাখি, ওই হিক সাহেব কিন্তু আস্ত ব্রহ্মদত্যি।"

"বটে। কিরকম ব্যাপার বলুন তো !"

সনাতন চারদিকটা চেয়ে দেখে নিয়ে বলল, "ও মনিষ্যি নয় রে।"

"তা হলে কী ?"

"বললুম না, ব্রহ্মদত্যি বা দানো। ইয়া উঁচু চেহারা, দত্যিদানোর মতো মস্ত শরীর। দেখিসনি ?"

"আজ্ঞে না। ও না দেখাই ভাল।"

"যা বলেছিস। তা হিক সাহেব কোথা থেকে আসে জানিস ? আকাশ থেকে। তার মস্ত একটা কৌটো আছে। সেই কৌটোটা যখন আকাশ থেকে নামে তখন নন্দপুরে বিনা মেঘে বিদ্যুৎ

চমকায়।”

সুবুদ্ধি অবাক হয়ে বলল, “কৌটোতে কী থাকে আজ্ঞে?”

“কেন, হিক নিজেই থাকে। ব্যাটা প্রেতলোক থেকে নেমে আসে, আবার প্রেতলোকেই ফিরে যায়। বড় সাঙ্ঘাতিক লোক। ব্রহ্মদত্যিটার সঙ্গে মাখামাখি করেই তো অঘোর সেনের মাথাটা বিগড়োল। নইলে একটু ঘুম পাড়াবার জন্য কেউ পাঁচ হাজার টাকা কবুল করে? হেঃ হেঃ হেঃ... কিন্তু তোকে এসব কথা বলছি কেন বল তো! তুই ব্যাটা আসলে কে? দেখে তো মনে হচ্ছে, এই মাত্র খেতে নিড়েন দিয়ে এলি।”

“আজ্ঞে ওরকমই কিছু ধরে নিন। এবার একটু জোর পাচ্ছেন শরীরে?”

“পাচ্ছি।”

“তা হলে এবার পা তুলতে হচ্ছে কর্তা। এই গর্তের ভেতর থেকে এবার না বেরোলেই নয়। কাজটা শক্ত হবে।”

সনাতন একটু হাঁটাহাঁটি করল নিজের পায়েই। একটু টালমাটাল হচ্ছিল বটে। কিন্তু কয়েকবারের চেষ্টায় পেরেও গেল। বলল, “কিন্তু অঘোরবাবু টাকাটা তো এখনও দিল না? গেল কোন চুলোয়?”

সুবুদ্ধি দেখে নিয়েছে এখান থেকে বেরনোর ওই একটাই পথ, যেটা দিয়ে সে নেমে এসেছে। ভরসা এই যে, এ ঘরে দূরদর্শী অঘোরবাবু শাবল টাবলের জোগাড় রেখেছেন, ভবিষ্যতে দরকার হতে পারে ভেবেই। নইলে, ল্যাবরেটরিতে শাবল থাকার কথা নয়। একটা টেবিল থেকে শিশি বোতল সরিয়ে সেটাকে দেওয়ালের গায়ে দাঁড় করাল সুবুদ্ধি। তার ওপরে সনাতনের বাক্সটাও রাখল। তারপর দরজার ফোকরটা নাগাল পেতে কোনও কষ্টই হল না।

সনাতন হাঁ করে কাণ্ডটা দেখছিল। বলল, "সিঁড়িটা ছিল যে! সেটার কী হল?"

সুবুদ্ধি বলল, "সিড়িঁ! আজ্ঞে সে আমি জানি না। চলে আসুন। এখন মেলা গা ঘামাতে হবে।"

সনাতনকে দরজার চৌকাঠে দাঁড় করিয়ে সুবুদ্ধি খুব সাবধানে শাবল দিয়ে ওপরকার মাটি সরাতে লাগল। একটু অসাবধান হলেই ওপর থেকে হুড়মুড় করে মাটির চাপড়া ঘাড়ে এসে পড়বে। তবে এসব কাজে সে খুব পাকা লোক। মাটি সরিয়ে সরিয়ে একটু একটু করে একটা ফোকর তৈরি করতে লাগল।

সনাতন ভারী বিরক্ত হয়ে বলল, "এসব কী ব্যাপার রে বাপু বল তো! এই তো কালকেও দিব্যি ফটফটে সিঁড়ি ছিল, এখানে! সেটা মাটি-চাপা পড়ল কীভাবে? ভূমিকম্প-টম্প কিছু হয়ে গেল নাকি?"

"ভূমিকম্পই বটে। দেড়শো বছরের পাল্লা তো চাট্টিখানি কথা নয়।"

সনাতন চটে বলল, "বারবার দেড়শো বছর দেড়শো বছর কী বলছিস বল তো! তুই কি পাগল নাকি রে?"

"পাগল তো ছিলুম না কর্তা, তবে এখন যেন একটু-একটু হতে লেগেছি। এমন অশৈলী কাণ্ড জীবনে দেখিনি কি না।"

"একটা কথা কিন্তু তোকে সটান বলে রাখছি বাপু, সেই পাঁচটি হাজার টাকা কিন্তু আমার চাই। অঘোর সেন কোথায় পিটটান দিল জানি না। তাকে না পেলে তোর কাছ থেকেই আদায় করব।"

"টাকা টাকা করে হেদিয়ে মরবেন না সনাতনবাবু। আগে তো গর্ভগৃহ থেকে বেরোন, তারপর টাকার কথা হবেখন।"

"মঙ্গলবার আমার জমির টাকা দিতে হবে, মনে থাকে যেন।"

"কত মঙ্গলবার এল আর গেল। মঙ্গলবারের অভাব কী ? মেলা মঙ্গলবার পাবেন।"

সুবুদ্ধি খুব ধীরে-ধীরে মাটির চাঙড় ভাঙতে লাগল।

ধীরে-ধীরে ওপরের দিকটা উন্মুক্ত হচ্ছে। সেই গুণ্ডাটা কি ওপরে ওত পেতে আছে ? থাকলেও চিন্তা নেই। সুবদ্ধির হাতে এখন শাবল। দরকার হলে শাবলের খোঁচায় ব্যাটাকে কাবু করা যাবে।

শেষ চাঙড়টা ধপাস করে ভেঙে ওপর থেকে ঝুরঝুর করে খানিক বালি আর সিমেন্টের গুঁড়ো ঝরে পড়ল। সুবুদ্ধি চোখ ঢেকে রেখেছিল। ধুলোবালি সরে যেতেই দেখতে পেল, ওপরে গর্তের মুখে ভোরের আবছা আলো দেখা যাচ্ছে। সুবুদ্ধি হাত নীচের দিকে বাড়িয়ে বলল, "আসুন সনাতনবাবু।"



গোবিন্দ বিশ্বাসের বাজার হয়ে যায় একেবারে সাতসকালে। দিনের আলো ফোটবার আগেই, যখন নন্দপুরের মানুষজন ঘুম থেকে ওঠেইনি ভাল করে। তা বাজার করার জন্য গোবিন্দ বিশ্বাসের কোনও ঝামেলাই নেই, এমনকী, তাঁকে বাজারে অবধি যেতে হয় না। সামনের বারান্দায় ঝুড়ি, ধামা, গামলা সব সাজানো থাকে পরপর। ব্যাপারিরা বাজারে যাওয়ার পথে আলু, বেগুন, পটল মুলো যখনকার যা সব ঝুড়িতে দিয়ে যায়। মাছওলারা এক-একজন এক-একদিন পালা করে মাছ দিয়ে যায় চুবড়ির মধ্যে। সপ্তাহে দুদিন গোবিন্দ বিশ্বাস মাংস খান, তা ঠিক দিনে

হরু কষাই সবচেয়ে পুরুষ্টু পাঁঠাটি কেটে রাং আর দাবনার সরেস মাংস রেখে যায়। দুধওলা গামলা ভরে দুধ দিয়ে যায়। মাসকাবারি জিনিসপত্র মাস পয়লা পৌঁছে দিয়ে যায় মুদি। গোবিন্দ বিশ্বাসের ভৃত্য মগন দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে সব নজর রাখে, তারপর জিনিসপত্র ঘরে নিয়ে যায়। বন্দোবস্তটা বাজারের ব্যাপারিরা নিজেদের বাঁচাতেই করেছে। আগে গোবিন্দ বিশ্বাস নিজেই বাজারে যেতেন আর তাঁকে দেখতে পেলেই বাজারে হুলুস্থুলু পড়ে যেত। ব্যাপারিরা সব চোখে চাপা দিয়ে চোঁ-চাঁ দৌড়ে পালাত। নিদেন পালাতে না পারলে মুখ ঢাকা দিয়ে মাথা নিচু করে বসে থাকত। বাজার হয়ে যেত সুনসান। তো তারাই একদিন এসে হাতজোড় করে গোবিন্দ বিশ্বাসকে বলল, "আজ্ঞে, আপনার মতো মান্যগণ্য লোক কষ্ট করে বাজার করলে আমাদেরই লজ্জা। বাজারে আপনি কেন যাবেন ? বাজার নিজেই হেঁটে আসবে আপনার দরজায়। দামের কথা তুলে আমাদের লজ্জায় ফেলবেন না। আপনার জন্য যে এটুকু করতে পারছি সেই আমাদের কত ভাগ্যি !"

সেই থেকে গোবিন্দ বিশ্বাস বাজারে যাওয়া ছেড়েছেন। পয়সা বাঁচছে, সময় বাঁচছে, ঝামেলা বাঁচছে। তা ছাড়া ব্যাপারিরা যা দিয়ে যায় সব বাছাই জিনিস। পচা-ঘচা, বাসি বা নিরেস জিনিস কেউ দেয় না। সকলেরই তো ভয় আছে। অপয়া হওয়ার যে কী সুখ তা তিনি আজ গভীরভাবে উপলব্ধি করেন। সামনের কয়েক জন্ম এরকম অপয়া হয়েই তাঁর জন্মানোর ইচ্ছে।

আজ সকালে বেশ তাড়াতাড়ি ঘুম ভাঙল গোবিন্দবাবুর। উঠে দাঁতন করতে করতে জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখলেন, আজ মাছের চুবড়িতে চিতল মাছের পেটি, লাফানো কই আর রুই মাছের মস্ত একটা খণ্ড পড়েছে। মেঠাইওলা রঘু আজ এক হাঁড়ি গরম

রসগোল্লা রেখে গেছে। এক ডজন ডিম আর এক শিশি ঘিও নজরে পড়ল। মনটা ভারী খুশি হয়ে গেল তাঁর। ব্যাপারিদের বাড়বাড়ন্ত হোক। হিরের টুকরো সব।

ভৃত্য মগন জিনিসগুলো সব ঘরে আনার পর তিনি দাঁতন করতে-করতেই একটু বারান্দায় বেরোলেন। আজকাল আর আগের মতো প্রাতর্ভ্রমণ হয় না। অন্য যারা সব প্রাতর্ভ্রমণ করে তারাই চাঁদা তুলে মাসের শেষে থোক কিছু টাকা দিয়ে যায়। সকলের দিকই তো দেখতে হবে, তাই প্রাতর্ভ্রমণ বন্ধ করেছেন। বারান্দাতেই একটু হাঁটাহাঁটি করেন।

আজ হাঁটাহাঁটি করতে গিয়ে হঠাৎ নজরে পড়ল, পাশের বাড়ির বারান্দায় বসে একটা লোক তাঁকে খুব ড্যাব ড্যাব করে দেখছে। তিনি ভারী অবাক হলেন। নতুন লোকই হবে। নইলে এই সকালবেলায় তাঁর মুখের দিকে চাইবে এমন বুকের পাটা কার আছে!

তবে তিনি খুশিও হলেন। মাঝে-মাঝে নিজের অপয়া ব্যাপারটা এভাবেই শামিয়ে নেওয়া যায়। একটু গলা-খাঁকারি দিয়ে তিনি মোলায়েম গলায় বললেন, "নতুন বুঝি?"

লোকটা একটু রোগাভোগা, চেহারাটাও ফ্যাকাসে। মেজাজাটা বেশ তিরিক্ষে। খ্যাঁক করে উঠে বলল, "কে নতুন?"

"এই তোমার কথাই বলছি ভায়া। সুবুদ্ধির কেউ হও বুঝি? কবে আসা হল?"

লোকটা রেগে গিয়ে বলল, "এই গাঁয়ে আমার সাত পুরুষের বাস তা জানেন? আসা হবে কেন? এই গাঁয়েই থাকা হয়।"

গোবিন্দবাবু অবাক হয়ে বললেন, "থাকা হয়? কোন বাড়ি বলো তো! এ-গাঁয়ে আমার ঊর্ধ্বতন দ্বাদশ পুরুষের বাস।"

লোকটা মাথা নেড়ে বলল, "ভাল মনে পড়ছে না। আমিও

ব্যাপটা ঠিক চিনতে পারছি না। এ বাড়িটা অঘোর সেনের তা জানি, কিন্তু বাদবাকি সব রাতারাতি পাল্টে গেছে দেখছি !”

“অঘোর সেন ! আ মলো, অঘোর-সেনটা আবার কে ?”

“অঘোর সেনকে চেনেন না ? আর বলছেন দ্বাদশ পুরুষের বাস !”

লোকটা পাগলটাগল হবে। আর না-ঘাঁটানোই ভাল, বিবেচনা করে গোবিন্দ বিশ্বাস বললেন, “তা সুবুদ্ধি ভায়াকে দেখছি না যে ! সে কোথায় গেল ?”

“সে কুয়োর পারে হাত-পা ধুচ্ছে আর তার ভাগ্নে ঘুমোচ্ছে। কিন্তু আমি ভাবছি এ কি দৈত্যদানোর কাণ্ড নাকি ? এত সব বাড়িঘর রাস্তাঘাট কোথা থেকে হল ? কবে হল ?”

গোবিন্দ বিশ্বাস একটু হেসে বললেন, “জন্মাবধিই দেখে আসছি। নতুন তো হয়নি। তা ভায়া কি এতদিন বিলেতে ছিলেন ?”

“বিলেত ! বিলেতে থাকব কেন মশাই ? ম্লেচ্ছ দেশ, সেখানে গেলে একঘরে হতে হবে না ?”

“হাসালে ভায়া। আজকাল আর ওসব কে মানে বলো তো ! আকছার লোকে যাচ্ছে। ওসব হত সেই আগের দিনে।”

সনাতন কেমন ক্যাবলার মতো চেয়ে থেকে বলল, “আচ্ছা মশাই, অঘোর সেনের বাড়ির এ পাশটায় তো একটা আমবাগান ছিল, আর বাঁশবন। তা আপনার এই বাড়িখানা কী করে রাতারাতি এখানে গজিয়ে উঠল ?”

“তোমার মাথায় একটু পোকা আছে ভায়া। রাতারাতি গজিয়ে উঠবে কেন ? পুবপাড়ায় বাপ-পিতেমোর আমলের বাড়ি ছেড়ে এখানে বাড়ি করে চলে এসেছি সেও আজ পঁচিশ বছর।”

সনাতন মাথায় হাত দিয়ে বলল, “উঃ, কী যে সব শুনছি তার

দেখছি আর ঠিক-ঠিকানাই নেই। পুবপাড়ায় তো আমারও বাস। আপনাকে তো জন্মে দেখিনি মশাই!"

গোবিন্দ বিশ্বাস বিজ্ঞের মতো হেসে বললেন, "আগেই সন্দেহ করেছিলুম, ভায়ার মাথায় একটু গণ্ডগোল আছে। পূবপাড়ায় যাকে জিজ্ঞেস করবে সেই দেখিয়ে দেবে বিশ্বাসবাড়িটা কোথায়। এ-তল্লাটে আমাকে চেনে না এমন লোক পাবে না।"

"বিশ্বাসবাড়ি! মশাই, মাথার গণ্ডগোল আমার না আপনার? পুবপাড়ায় তো বিশ্বাসবাড়ি একটাই। আর সেই বাড়িই যে আমার। ঊর্ধ্বতন সপ্ত পুরুষের বাস মশাই। পিতা শ্রীহরকালী বিশ্বাস, পিতামহ স্বর্গত জগদীশচন্দ্র বিশ্বাস। সবাই চেনে কিনা। আপনি হুট করে বিশ্বাসবাড়িটা নিজের বলে গলা তুললেই তো হবে না!"

"হাসালে ভায়া। বেশ মজার লোক তুমি হে। হোঃ হোঃ হোঃ..."

"কেন, এতে হাসার কী আছে? সহজ সরল ব্যাপার।"

"নাঃ, স্বীকার করতেই হচ্ছে যে, তুমি বড় রসিক মানুষ। পুবপাড়ার বিশ্বাসবাড়িটাও যে তোমার বাড়ি, জেনে বড্ড খুশি হলুম।"

সনাতন একটু ভ্যাবলা হয়ে বলল, "এ তো বড় মুশকিল দেখছি! সেই বাড়িতে জন্ম হল, এইটুকু থেকে এতবড়টি হলুম, আর আপনি বলছেন রসিকতা? হাতে পাঁজি মঙ্গলবার, অত একরারে কাজ কী? গিয়েই দেখাচ্ছি। এখনই শরীরটা একটু টালমাটাল করছিল বলে জিরিয়ে নিচ্ছিলুম একটু, নইলে অঘোর সেনের বাড়িতে বসে আছি কি সাধে?"

"অঘোর সেনের বাড়ি? হাঃ হাঃ হোঃ হোঃ... বাপু হে, শরীর তোমার টালমাটাল করছে কি সাধে? এই বয়সেই নেশাভাঙ ধরে

ফেলেছ বুঝি ? এই বুড়ো মানুষটার কথা যদি শোনো তবে বলি ও-পথে আর হেঁটো না। শুনেছি নেশাভাঙ করলে পরের বাড়িকে নিজের বাড়ি মনে হয়, নর্দমাকে মনে হয় শোওয়ার ঘর, বাঘকে মনে হয় বেড়াল। আর হরকালী বিশ্বাসের কথা কী বলছিলে যেন ?"

"কেন, তিনি আমার পিতাঠাকুর।"

"হাঃ হাঃ হাঃ ...হোঃ হোঃ হোঃ ...হরকালী বিশ্বাস যদি তোমার পিতাই হন, তা হলে তোমার বয়সটা কত দাঁড়ায় জানো ?"

"কেন, আঠাশ বছর।"

"আঠাশ বছর ! হাসতে-হাসতে পেটে যে খিল ধরিয়ে দিলে ভায়া ! আঠাশের আগে যে আরও একশো বা দেড়শো বছর জুড়তে হবে, সে-খেয়াল আছে ? হরকালী বিশ্বাস, জগদীশচন্দ্র বিশ্বাস কবেকার লোক তা জানো ? এঁরা সব আমারই নমস্য পূর্বপুরুষ। তাঁদের নিয়ে ঠাট্টা-ইয়ার্কি নয়। সেইজন্যই তো বলি, নেশাভাঙ করলে এরকম যত গণ্ডগোল হয়।"

সনাতন বিশ্বাস দুর্বল পায়ে উঠে দাঁড়াতে-দাঁড়াতে বলে উঠল,"খবরদার বলছি, নেশাভাঙের কথা তুলে খোঁটা দেবেন না ! আমি জন্মে কখনও তামাকটা অবধি খাইনি ! আমাদের বংশে নেশাভাঙের চলন নেই। কেউ বলতে পারবে না যে, সনাতন বিশ্বাস কখনও সুপুরিটা অবধি খেয়েছে !"

গোবিন্দ বিশ্বাস হঠাৎ হেঁকে উঠে বললেন, "কে ? কার নাম করলে ? সনাতন বিশ্বাস !"

"যে আজ্ঞে। এই অধমের নামই সনাতন বিশ্বাস, পিতা হরকালী, পিতামহ জগদীশচন্দ্র বিশ্বাস। আরও শুনবেন ? প্রপিতামহ তারাপ্রণব বিশ্বাস। বৃদ্ধ প্রপিতামহ অক্ষয়চন্দ্র বিশ্বাস।"

চোখ গোল করে গোবিন্দ বিশ্বাস বললেন, "এ যে আমার কুলপঞ্জি তুমি মুখস্থ বলে যাচ্ছ হে ! কিন্তু এত সব তো তোমার জানার কথা নয়, সনাতন বিশ্বাস নাম বলছ ? তা তিনিও আমার এক প্রাতঃস্মরণীয় পূর্বপুরুষ। তাঁর দুই ছেলে নিত্যানন্দ আর সত্যানন্দ। সত্যানন্দ সাধু হয়ে গিয়েছিলেন, নিত্যানন্দের সাত ছেলে অভয়পদ, নিরাপদ, কালীপদ, ষষ্ঠীপদ, শীতলাপদ, দুর্গাপদ আর শিবপদ। আমরা হলুম গে দুর্গাপদর বংশধারা। তাঁর ছিল পাঁচ ছেলে..."

"থামুন মশাই, থামুন। নিত্যানন্দর বয়স এখন মাত্র ছয় বছর। তার সাতটা ছেলে হয় কোত্থেকে ? গাঁজা আমি খাই, না আপনি খান ?"

ঝগড়াটা যখন ঘোরালো হয়ে উঠছে, তখন সুবুদ্ধি এসে মাঝখানে পড়ল, "আহা করেন কী, করেন কী বিশ্বাসমশাই ? সদ্য লম্বা ঘুম থেকে উঠেছেন, এখন কি এত ধকল সইবে ? পৌনে দুশো বছর বয়সের শরীরটার কথাও তো ভাবতে হয় ! আসুন, ঘরে আসুন।"

বলে সনাতনকে একরকম টেনেহিঁচড়েই ঘরে নিয়ে গেল সুবুদ্ধি।

গোবিন্দ বিশ্বাস একটু হেঁকে বললেন, "যতই তর্ক করো বাপু, আজ ঠেলাটি বুঝবে। প্রাতঃকালেই আজ এই শর্মার মুখখানা দেখেছ, যাবে কোথায় ? বলে কিনা উনিই সনাতন বিশ্বাস। সনাতন বিশ্বাস হওয়া কি মুখের কথা ? অনেক জন্ম তপস্যা করে তবে সনাতন বিশ্বাস হতে হয়। তাঁর মতো অপয়া ভূ-ভারতে ছিল না। আর অত নামডাক হচ্ছিল বলেই তো তাঁকে গুমখুন করে ফেলা হয়। লাশটার অবধি হদিস কেউ পায়নি। আর ইনি কোত্থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসে বুক বাজিয়ে বলছেন, আমিই

সনাতন বিশ্বাস। হুঁঃ।"

ঘরের মধ্যে তখন সনাতন বিশ্বাস চোখ গোলগোল করে গোবিন্দর চেঁচামেচি শুনতে-শুনতে সুবুদ্ধিকে বলল, "কী বলছে বল তো লোকটা?"

"আজ্ঞে, ওদিকে কান না দেওয়াই ভাল। আর আপনিও বড্ড ভুল করে বসেছেন। প্রাতঃকালে ওঁর মুখখানা না দেখলেই ভাল করতেন। উনি ঘোর অপয়া লোক। ভুলটা আমারই। আপনাকে সাবধান করে দেওয়া উচিত ছিল। যাকগে, যা হওয়ার হয়ে গেছে। আজ একটু সাবধানে থাকবেন।"

সনাতন একটু আত্মবিশ্বাসের হাসি হেসে বলল, "আমাকে অপয়া দেখাচ্ছিস! শুনলেও হাসি পায়। ওরে, আমি এমন অপয়া লোক যে, প্রাতঃকালে আমার মা অবধি আমার মুখ দেখত না। আমি রাস্তায় বেরোলে কুকুর-বেড়াল অবধি পাড়া ছেড়ে পালাত।"

"অ্যাঁ," বলে সুবুদ্ধি এমন হাঁ করল যে, তাতে চড়াইপাখি ঢুকে যেতে পারে। তারপর ঢোক গিলে কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলল, "তা হলে কী হবে! আমি যে প্রাতঃকাল থেকে আপনার মুখ দেখছি।"

সনাতন ভ্রূ কুঁচকে বলল, "তা অবশ্য ঠিক। তবে তোকে একটা গুপ্ত কথা বলতে পারি। খবরদার আর কাউকে বলবি না তো?"

"আজ্ঞে না।"

"পাশের বাড়ির লোকটা কীরকম অপয়া বল তো!"

"আজ্ঞে সাঙ্ঘাতিক।"

"দূর দূর! তেমন অপয়া হলে পাড়ায় কুকুর-বেড়ালও থাকত না। আমি তো দেখলুম, ওর বারান্দার সিঁড়িতে দিব্যি গ্যাঁট হয়ে

একটি বেড়াল বসে আছে। তা যাকগে, কমজোরি অপয়া হলেও চলবে। তুই যদি সকালে দু-দুটো অপয়ার মুখ দেখে ফেলিস, তা হলে আর ভয় নেই। একটার দোষ আর-একটায় কেটে যাবে।"

"বটে !"

"খবরদার, পাঁচ কান করিস না।"

"আজ্ঞে না।"

"তা হলে আমি এবার বাড়ি চললুম। গিয়ে গোরুগুলোকে মাঠে ছাড়তে যেতে হবে, গেরস্থালির আরও কত কাজ পড়ে আছে। অঘোরবাবুকে পেলে টাকাটা আদায় করে নিয়ে যেতুম। কিন্তু আর দেরি করার জো নেই।"

সুবুদ্ধি খুব বিনয়ের সঙ্গে বলল, "যে আজ্ঞে, বাড়ি যাবেন সে আর বেশি কথা কী ? তবে একটা গণ্ডগোল হয়ে গেছে কিনা, তাই বলছিলুম—"

"গণ্ডগোল ! কিসের গণ্ডগোল ?"

"আজ্ঞে, আপনার ঘুমটা একটু বেশি লম্বা হয়ে গেছে কিনা, তাই—"

"অ্যাঁ ! খুব লম্বা ঘুম ঘুমিয়েছি নাকি ? তা সেটা কত লম্বা ? দু'দিন, তিনদিন নাকি রে ?"

"আজ্ঞে না। আর একটু উঠুন।"

"ওরে বাবা ! দু-তিনদিনেরও বেশি ? তবে কি দিনপাঁচেক ?"

"আরও একটু উঠুন।"

"আরও ? ও বাবা, আমার যে মাথা ঘুরছে।"

"তা হলে একটু শক্ত হয়ে বসুন। তারপর একটু চিঁড়ে দই ফলার করে নিন। তাতে গায়ে একটু বল হবে। মনটাকে বেশ হালকা করে রাখুন।"

সনাতন দই-চিঁড়ে খেল। তারপর বিছানায় বেশ জুত করে

বসল, “এবার বল তো বৃত্তান্তটা কী।”

“আজ্ঞে আপনি টানা দেড়শো বছর ঘুমিয়ে ছিলেন।”

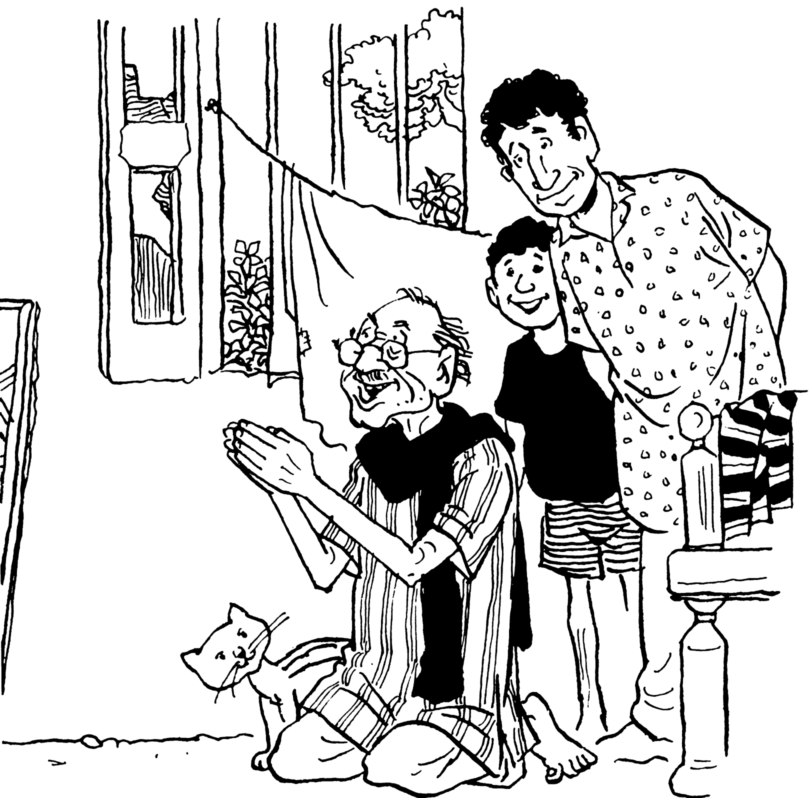
সনাতন সোজা হয়ে বসে বলল, “দেড় বছর ! বলিস কী রে ডাকাত ! দেড় বছর কেউ ঘুমোয় ? তুইও দেখছি নেশাখোর !”

“দেড় বছর হলে তো কথাই ছিল না মশাই। দেড় বছর নয়। দেড়শো বছর।”



সনাতন এবার এমন হাঁ হল যে, তাতে একটা ছোটখাটো বেড়াল ঢুকে যায়। তারপর খানিকক্ষণ খাবি খেয়ে বলল, "তুই খুব নেশা করিস।"

"আজ্ঞে না। ভাল করে যদি চেয়ে দেখেন চারদিকটায় তা হলেই বুঝতে পারবেন। কিছু কি আর আগের মতো আছে দেখছেন ? অত বড় আমবাগান আর বাঁশবাগান কোথায় গেল ?"



সনাতন ঢোক গিলে বলল, "একটু-একটু মনে পড়ছে সব। অঘোরবাবুর বাড়ির উলটো দিকে একটা মস্ত ঝিল ছিল। সেটাও তো দেখছি না।"

"আজ্ঞে, দেড়শো বছর লম্বা সময়।"

"তা হলে আমার বাড়ি! আমার বাপ-মা ছেলেপুলে সব? তাদের কী হল?"

"আজ্ঞে, দেড়শো বছরে কি কিছু থাকে? তবে পুত্রপৌত্রাদি এবং তস্য তস্য পুত্রপৌত্রাদি নিশ্চয়ই আছে।"

"তার মানে কেউ বেঁচে নেই বলছিস নাকি?"

"বেঁচে থাকলে কি ভাল হত মশাই? তবে সবাই বেশ দীর্ঘজীবী হয়েই সাধনোচিত ধামে গমন করেছেন।"

"এ-হো-হো.... !" বলে সনাতন ডুকরে কেঁদে উঠল। সেই বুক-ফাটা কান্নায় সুবুদ্ধিরও চোখে জল এসে গেল। সে তাড়াতাড়ি সনাতনের পিঠে হাত বোলাতে-বোলাতে বলল, "অত উতলা হবেন না। বয়সটার কথাও একটু বিবেচনা করুন। এই পৌনে দুশো বছর বয়সে অত উতলা হলে ধকল সামলানো যে মুশকিল হবে।"

সনাতন হঠাৎ কান্না থামিয়ে সচকিত হয়ে বলল, "কত বললি?"

"আজ্ঞে হিসেবমতো পৌনে দুশো বছরেরও একটু বেশি।"

"উরে বাবা রে! তা হলে তো বড্ড বুড়ো হয়ে গেছি! সর্বনাশ! এত বুড়ো নাকি রে আমি? হিসেবে কিছু ভুল হয়নি তো রে?"

"আজ্ঞে না। দু-চার বছর এদিক-ওদিক হতে পারে।"

"একটু কম করে ধরলে হয় না রে?"

"চাইলে করতে পারেন। আসলে আপনি তো আটকে আছেন

সেই আঠাশেই।"

"আঠাশ! এই যে বলছিস পৌনে দুশো!"

"দুটোই ঠিক। একদিক দিয়ে দেখলে আঠাশ, অন্যদিক দিয়ে দেখতে গেলে পৌনে দুশো।"

"ওরে বাপ রে? তা হলে আমি বুড়ো হতে-হতে জরদগব হয়ে পড়েছি। হাঁটাচলা করতে পারব কি? চোখে ছানি হয়নি তো! হ্যাঁ রে দাঁতগুলো সব গেছে নাকি? আরও কী-কী হল দেখ তো ভাল করে।"

"আজ্ঞে, ওসব ঠিকই আছে।"

"ঠিক আছে কী রে? পৌনে দুশো বছরে যে লোহা অবধি ক্ষয় হয়ে যায়। দাঁড়া বাপু দাঁড়া, ভাল করে হেঁটেচলে দেখি পায়ের জোড়গুলো ঠিক আছে কি না।"

"আজ্ঞে আছে। এতক্ষণ হাঁটাচলাই করছিলেন। দিব্যি পাতালঘর থেকে ওপরে উঠে এলেন।"

হঠাৎ সনাতন কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলল, "হ্যাঁ রে, আমার নিত্যানন্দ আর সত্যানন্দ। তারা বেঁচে নেই?"

"দুঃখ করবেন না বিশ্বাসমশাই। তাঁরা সব পাকা বয়সেই গেছেন। শুনলেন তো, নিত্যানন্দের সাত ছেলে ছিল।"

"নিত্যানন্দকে যে মাত্র ছ' বছরের রেখে আমি কালঘুম ঘুমোতে এলাম। কত বয়স হয়েছিল তার বল তো!"

সুবুদ্ধি বানিয়ে বলল, "আজ্ঞে নব্বই বছর। দুঃখের কিছু নেই, এই তো শুনলেন আমাদের গোবিন্দ বিশ্বাসই আপনার অধস্তন কত পুরুষ যেন।"

"ওই বিচ্ছিরি ঝগড়ুটে লোকটা?"

"যে আজ্ঞে।"

সনাতন খানিকক্ষণ গুম হয়ে থেকে হঠাৎ চনমনে হয়ে বলল,

"ওরে ডাক তো খোকাটিকে। আমারই তো বংশ। ডাক তো, ভাল করে একটু মুখখানা দেখি।"

"আজ্ঞে, এই ডাকছি।" বলে বারান্দায় গিয়ে ভারী বিনীত গলায় সুবুদ্ধি ডাকল, "গোবিন্দদা ! ও গোবিন্দদা। একটু বাইরে আসবেন ?"

গোবিন্দ বিশ্বাস বারান্দায় এসে সুবুদ্ধির দিকে অবাক চোখে চেয়ে বললেন, "এই প্রাতঃকালটায় আমার মুখ দেখে ফেললে যে ! তোমার তো বড্ড সাহস দেখছি হে ! বিপদে পড়লে আমার দোষ দিয়ো না যেন। আমি পাড়াপ্রতিবেশীকে কখনও বিপদে ফেলতে ভালবাসি না।"

সুবুদ্ধি মাথা চুলকে হাসি-হাসি মুখ করে বলল, "আজ্ঞে সেই কথাটাই বলার জন্য ডাকা আপনাকে। অপরাধ নেবেন না। অপয়া দর্শনের একটা ভাল নিদান পাওয়া গেছে। দয়া করে যদি গরিবের বাড়িতে একটু পায়ের ধুলো দেন !"

"নিদান পেয়েছ ! তবে তো ভয়ের কথা হল হে। নিদানটা আবার পাঁচজনকে চিনিয়ে বেড়িয়ো না। করে-কর্মে খাচ্ছি, ব্যরসা লাটে উঠবে। দাঁড়াও, চটিজোড়া পায়ে গলিয়ে আসছি।"

গোবিন্দ বিশ্বাস এলেন এবং মন দিয়ে সব শুনলেন। তাঁর চোখ জ্বলজ্বল করতে লাগল, গলা ধরে এল, গলবস্ত্র হয়ে একেবারে উপুড় হয়ে পড়লেন সনাতনের পায়ে, "এও কি সম্ভব ? এই চর্মচক্ষে আপনার দেখা পাব—এ যে স্বপ্নেও ভাবিনি ! আপনি হলেন আমার ঠাকুর্দার ঠাকুরদার ঠাকুর্দা... না, একটা ঠাকুর্দা বোধ হয় কম হল !"

সনাতন বড় আদরে গোবিন্দর মুখখানা তুলে দু' হাতে ধরে নিরীক্ষণ করতে-করতে গদগদ হয়ে বললেন, "তা হোকগে, একটা ঠাকুর্দার কম বা বেশি হলে কিছু না। আহা, এ তো দেখছি আমার

নিত্যানন্দের মুখ একেবারে কেটে বসানো ? নাকখানা অবশ্য সত্যানন্দের মতো। আহা, খোকাটিকে দেখে বুক জুড়িয়ে গেল। তা হ্যাঁ রে দুষ্টু, তোর বাপ বেঁচে নেই ?"

চোখের জল মুছতে-মুছতে গোবিন্দ বিশ্বাস বললেন, "আজ্ঞে আছেন। বিরানব্বই চলছে।"

"ডাক, ডাক তাকে। বিরানব্বই আবার একটা বয়স নাকি ! দুধের শিশুই বলতে হয়।"

তা বিরানব্বই বছরের বাপও এসে সব শুনে ভেউ- ভেউ করে কেঁদে সনাতনের পা জড়িয়ে ধরলেন। সনাতন তাঁকে আদরটাদর করে, গালে ঠোনা মেরে খুব চনমনে হয়ে উঠলেন। শোকটা কেটে গেল।

তারপর গোবিন্দ বিশ্বাসের দিকে চেয়ে বললেন, "তুই নাকি খুব অপয়া রে ভাই ?"

গেবিন্দ বিশ্বাস তাড়াতাড়ি সনাতনের পায়ের ধুলো নিয়ে লজ্জায় মাথা নত করে বলল, "আপনার তুলনায় নস্যি। তবে অপয়া বলেই চারটি খেতে-পরতে পারছি। লোকে মানে-গোনে।"

"বাঃ বাঃ। শুনে খুব খুশি হলুম। তবে মুশকিল কী জানিস ? প্রাতঃকালে যদি দু'-দুটো অপয়ার মুখ দেখতে পায় মানুষ, তা হলে আর অপয়ার দোষ থাকে না। কেটে যায়।"

গোবিন্দ আঁতকে উঠে বললেন, "সর্বনাশ ! তা হলে যে ব্যবসা লাটে উঠবে ! সুবুদ্ধি বুঝি এই নিদানের কথাই বলছিল ?"

সনাতন গম্ভীর হয়ে বলল, "হ্যাঁ। তবে তোর ব্যবসা আমি নষ্ট করব না। ঘর-সংসার যখন নেই তখন আর এখানে থেকে হবেটা কী ? ভাবছি, হিমালয়ে গিয়ে সাধু হয়ে যাব।"

"আজ্ঞে তাই কি হয় ?" বলতে-বলতে ঘরে ঢুকলেন .সমাজ

মিত্তির আর ভূতনাথ নন্দী। তাঁদের একটু পেছনে বটকেষ্ট আর দ্বিজপদ। সুবুদ্ধি শশব্যস্তে তাদের বসবার জায়গা করে দিল।

সমাজ মিত্তির সনাতনের পায়ের ধুলো নিয়ে বললেন, "ঘটনাটা এই মাত্র সেদিন এক বিলিতি জার্নালে বেরিয়েছিল। তারাও খুব একটা বিশ্বাস করেনি। তারা কেবল তাদের পুরনো জার্নাল থেকে রিপ্রিন্ট করেছিল খবরটা। তাতেই আমি জেনেছিলুম যে, পাগলা বৈজ্ঞানিক অঘোর সেন কী একটা পদ্ধতি জানতেন যাতে মানুষকে অবিকৃত অবস্থায় বহু বছর ঘুম পাড়িয়ে রাখা যায়। এবং সে বাবদে একটা এক্সপেরিমেন্টও নাকি করে গেছেন। কিন্তু এক্সপেরিমেন্টটা কোথায় করেছিলেন তার হদিস জার্নালটায় দিতে পারেনি। শুধু লেখা ছিল, নন্দপুর গাঁয়েই একটা লোককে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে। লোকটার নাম সনাতন বিশ্বাস। কিন্তু অঘোরবাবু বিয়ে করেননি, তাঁর বংশধর বলেও কেউ নেই। ফলে মৃত্যুর পরই তাঁর বাড়িতে অন্য সব লোক বসবাস শুরু করে। তবে জার্নালে প্রবন্ধটা বেরনোর পর আমার মতো দু-চারজন খোঁজখবর শুরু করেছিল। এই যে ভূতনাথ নন্দী, ইনিও তাঁদের মধ্যে একজন। তিনি অবশ্য বুদ্ধি করে অঘোর সেনের নাম উহ্য রেখে এ-গাঁয়ের পুরনো ভূতের বাড়ি খুঁজতে থাকেন। তিনি অবশ্য একটা বাড়ি অনুমানে ভর করে কিনেও ফেললেন। কিন্তু সেই বাড়ি অঘোর সেনের নয়। অঘোর সেনের বাড়িটা কিনল সুবুদ্ধি রায়। যাই হোক, গতকাল থেকে এ-গাঁয়ে একজন সাঙ্ঘাতিক লোকের উদয় হয়েছে, যে অঘোর সেনের বাড়ি খুঁজে বেড়াচ্ছে। কোনওরকম বাধা দিলেও সে মেরে বসছে লোককে। বাধা না দিলেও সন্দেহের বশে মারছে। আমাদের সন্দেহ, লোকটা অঘোর সেনের ল্যাবরেটরি আর সনাতন বিশ্বাসের সন্ধান করে মস্ত দাঁও মারার চেষ্টায় আছে। দেড়শো বছর আগেকার ল্যাবরেটরিতে

কী কাণ্ড করেছিলেন অঘোর সেন, তা জানলে দুনিয়া তাজ্জব হয়ে যাবে। আর সনাতনবাবুকে তো ছিঁড়ে খাবে দুনিয়ার বৈজ্ঞানিকরা। কাজেই এখন সনাতনবাবু এবং অঘোর সেনের ল্যাবরেটরি হামলাবাজদের হাত থেকে বাঁচানোটাই আমাদের প্রধান কাজ।"

ভূতনাথবাবু বললেন, "আমি নিজেই একজন সায়েন্টিস্ট। আমি জানি, ঘটনাটা প্রায় অলৌকিক। অঘোর সেন আইনস্টাইনের চেয়ে কম নন।"

সনাতন বলে উঠল, "ইঞ্জিরি বলছ নাকি খোকা ? ওইসব ভাষা যে আমি বুঝি না।"

ভূতনাথ বললেন, "আপনার বোঝার কথাও নয়। আইনস্টাইন আপনার অনেক পরে জন্মেছেন। কিন্তু কথা হল, আমাদের সামনে এখন কঠিন বিপদ। লোকটা কাল আমাকে আর আমার সহচরটিকে প্রায় যমের বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছিল। ঘরে-ঘরে গর্ত খুঁড়ে দেখেছে কোথাও পাতালঘর আছে কি না। এর পর সে দ্বিজপদকেও মেরে তাড়ায়। শুনলাম সে মধ্যরাতে সুবুদ্ধি রায়কেও নাকি মেরে একটা গর্তে ফেলে দেয়।"

সুবুদ্ধি বিনয়ের সঙ্গে বলল, "সে-কাজটা উনি ভালই করেছেন। গর্তে আমাকে ফেলে দিয়েছিলেন বলেই অঘোর সেনের ল্যাবরেটরি আর সনাতনবাবুর হদিসটা পাওয়া গেল। কিন্তু লোকটা কে বলুন তো ! বাংলায় কথা বলছিল বটে কিন্তু বাঙালি বলে মোটেই মনে হল না। আর গায়ে কী সাঙ্ঘাতিক জোর। আমাকে যেন পুতুলের মতো তুলে সপাং করে ছুড়ে ফেলে দিল। এরকম পালোয়ান লোক আমি জন্মে দেখিনি।"

ভূতনাথ চিন্তিতভাবে বললেন, "সেইটেই ভয়ের কারণ। লোকটা কে বা কোত্থেকে এল তা আমরা জানি না। কিন্তু সে যে

সাঙ্ঘাতিক বিপজ্জনক লোক, তাতে সন্দেহ নেই। যাকগে, ওটা নিয়ে পরে ভাবা যাবে। আপাতত আপনাদের আপত্তি না থাকলে ল্যাবরেটরিটা আমি একটু দেখতে চাই।"

"আসুন, আসুন," বলে সুবুদ্ধি খাতির করে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল সবাইকে।

একটু কষ্ট করেই একে-একে ল্যাবরেটরিতে নামলেন ভূতনাথ সুবুদ্ধি আর সমাজ মিত্তির। আর কাউকে যেতে দিলেন না ভূতনাথ। প্রদীপটা এখনও জ্বলছে। ঘরভরা উজ্জ্বল আলো।

প্রথমে প্রদীপটাই একটু পরীক্ষা করলেন ভূতনাথ। মাথা নেড়ে বলেন, "এরকম কখনও দেখিনি। আমাদের বিজ্ঞান এ-জিনিস এখনও কল্পনা করতে পারেনি।"

টেবিলের ওপর যে দুটো বন্ধ বাক্স রয়েছে, খুব সাবধানে একে একে সে-দুটোও খুললেন ভূতনাথ। ভেতরে ঝকঝকে কিছু অদ্ভুতদর্শন জিনিস এবং যন্ত্র রয়েছে। ভূতনাথ অনেকক্ষণ ধরে টর্চ জ্বেলে ভেতরটা দেখে নিয়ে ফের মাথা নেড়ে বলেন, "এসব যন্ত্রপাতি দেড়শো বছর আগে কেউ কল্পনা করেছিল, ভাবাই যায় না! এসব তো আজকের দিনেও আমরা কল্পনাই করি মাত্র। অঘোর সেন কী ধরনের মানুষ ছিলেন বুঝতে পারছি না। এসব সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি তৈরিই বা করলেন কী করে। খুবই আশ্চর্য ব্যাপার।"

সুবুদ্ধি বলল, "সনাতনবাবু বলছিলেন, হিকসাহেব বলে কে একজন অঘোরবাবুর কাছে আসত। সে নাকি মানুষ নয়, ভূত। অঘোরবাবু ওই বাক্সটার গায়ে সাঁটা কাগজটাতেও হিক সাহেবের কথা লিখেছেন।"

ভূতনাথবাবু লেখাটা দেখে বললেন, "হুঁ। অঘোর সেনের আমলে যে এসব সফিস্টিকেটেড যন্ত্রপাতি পৃথিবীতে তৈরি হত না

সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু হিকসাহেবটা কে, তা বুঝতে পারছি না। হিক নামে কোনও বড় বৈজ্ঞানিকের নাম তো শুনিনি !"

সুবুদ্ধি বলল, "সনাতনবাবু বলেন, হিক আকাশ থেকে কৌটো করে নেমে আসত। আর তখন নন্দপুরে বিনা মেঘেও বিদ্যুৎ চমকাত।"

ভূতনাথ হাঁ করে চেয়ে থেকে বললেন, "আকাশ থেকে ! কৌটো করে ! এসব তো আষাঢ়ে গল্প।"

সনাতনবাবুর দৃঢ় বিশ্বাস হিকসাহেব ভূত ছাড়া কিছু নয়।

ভূতনাথবাবু বললেন, "ভূত বলে কিছু নেই। তবু হিক যদি ভূতই হয় তা হলেও বাঁচোয়া ! কিন্তু ভূত না হলে চিন্তার কথা। চলুন সমাজবাবু, ওপর যাওয়া যাক। ল্যাবরেটরিটা এক অমূল্য সম্পদ। একে রক্ষা করার জন্য ভাল ব্যবস্থা করতে হবে। আবার পাঁচকান করাও চলবে না। তা হলে গুচ্ছের লোক এসে ভিড় করবে। বাছা-বাছা লোকজন নিয়ে পাহারা বসানো দরকার। নইলে ওই হামলাবাজটা এসে আবার ঝামেলা পাকাতে পারে।"

"যে আজ্ঞে, যথার্থই বলেছেন। লোকটা ঝামেলা পাকাবেই। আমাকে গর্তের মধ্যে ছুড়ে ফেলে লোকটা যখন পালিয়ে যায় তখন আমার ভাগ্নে কার্তিক বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল। লোকটাকে দেখে সে একটা থামের আড়ালে লুকিয়ে পড়ে। সে নিজের কানে শুনেছে লোকটা চাপা গলায় অদ্ভুত ভাষায় কী যেন বলছিল। ভাষাটা সে বুঝতে পারেনি। তবে দেখেছে, লোকটা চকের মতো একটা জিনিস দিয়ে আমাদের বাইরের দেওয়ালে একটা ঢ্যাঁড়া কেটে দিয়ে চলে যায়। সেই ঢ্যাঁড়ার দাগটা নাকি অন্ধকারে জ্বলজ্বল করছিল।"

"বলেন কী ?" ভূতনাথবাবু অবাক হয়ে বললেন, "এতক্ষণ বলেননি কেন ?"

"আজ্ঞে। একসঙ্গে অনেক ঘটনার ধকল সামলাতে হচ্ছে তো ! কোনটা আগে বলব, কোনটা পরে, তার তাল রাখতে পারছি না।"

"চলুন তো দাগটা দেখি।"

মাথা নেড়ে সুবুদ্ধি বলল, "আমি দেখেছি, কোনও দাগ নেই। মনে হচ্ছে ওটা এমন একটা জিনিস, যা রাত্রে জ্বলজ্বল করে, কিন্তু দিনের আলোয় অদৃশ্য হয়ে যায়।"

ভূতনাথ গম্ভীর হয়ে বললেন, "হ্যাঁ, এরকম জিনিস থাকতেই পারে। তার মানে বাড়িটা দেগে রেখে গেছে। তার মানেই হচ্ছে লোকটা রাতের দিকেই আসবে। আর তারও মানে হচ্ছে, লোকটা বুঝতে পেরেছে যে, এটাই অঘোর সেনের বাড়ি।"

সুবুদ্ধি একগাল হেসে বলল, "আজ্ঞে, তার মানে হচ্ছে আমাদের সামনে এখন অঘোর বিপদ। অঘোরবাবু এতসব কাণ্ড-ফাণ্ড না করলে আজ এত নাকাল হতে হত না।"

ভূতনাথবাবু করুণ অসহায় গলায় সমাজবাবুর দিকে চেয়ে বললেন, "এ-গাঁয়ে ব্যায়ামবীর-টির নেই ? কিংবা ক্যারাটে, কুংফু জানা লোক ?"

সমাজ মিত্তির মাথা নেড়ে বললেন, "না হে, নন্দপুরে ব্যায়ামবীর কেউ আছে বলে জানি না। ক্যারাটের নামও কেউ শুনেছে কি না সন্দেহ।"

"আচ্ছা, কার-কার বাড়িতে বন্দুক-পিস্তল আছে বলুন তো !"

"না রে বাপু, গাঁয়ের লোকের অত পয়সা কোথায় ? যদু সামন্তর একটা গাদা বন্দুক ছিল, তাও বহু পুরনো। সেদিন দেখলুম যদু সামন্তর নাতবউ সেটা দিয়ে নর্দমা পরিষ্কার করছে।"

"তা হলে তো চিন্তার কথা !"



নন্দপুরের পুবপাড়া যেখানে শেষ হয়েছে তার পর থেকে ঘোর জঙ্গল, দিনের বেলাতেও জায়গাটা অন্ধকার। দেড়শো বছর আগে একসময়ে এখানে কুখ্যাত তারা তান্ত্রিকের ডেরা ছিল। জনশ্রুতি আছে এখানে নিয়মিত নরবলি হত। জঙ্গলের একেবারে ভেতরে নিবিড় বাঁশবনের মাঝখানে পুরনো পরিত্যক্ত একখানা কালীমন্দির। মন্দিরের বেশিরভাগই ভেঙে পড়েছে। সাপখোপ আর তক্ষকের বাসা। বাদুড় আর চামচিকের আড্ডা। বহুকাল এই জায়গায় কোনও মানুষ আসেনি। কালীমন্দিরের লাগোয়া পুকুরটাও সংস্কারের অভাবে হেজেমজে গিয়েছিল। তবে মাঝখানটায় এখনও গভীর জল।

বিকেল গড়িয়ে সন্ধে হয়ে আসছে। চারদিকে পাখিদের কিচিরমিচিরে কান পাতা দায়। কালীমন্দিরের চাতাল দিয়ে ধীর পায়ে দুটো নেকড়ে এদিক-ওদিক তাকাতে-তাকাতে চলে গেল। বাঁশবন থেকে বেরিয়ে গোটাচারেক শেয়াল দ্রুতবেগে দৌড়ে আর-একধারের বাঁশবনে গিয়ে সেঁধোল। একপাল বুনো কুকুরের ডাক নিস্তব্ধতাকে হঠাৎ খানখান করে ভেঙে দিচ্ছিল।

মন্দিরের ভেতরে ঘুটঘুট্টি অন্ধকার। যে বেদিটার ওপর এককালে বিগ্রহ ছিল, তার ওপর ধুলোময়লার মধ্যেই শুয়ে ছিল একটা লোক। পরনে একটা ময়লা প্যান্ট, গায়ে একটা ময়লা হাওয়াই শার্ট। লোকটা নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছিল। আচমকাই বেদির নীচের ফাটল থেকে একটা মস্ত গোখরো সাপ হিলহিল করে

বেরিয়ে এল। তারপর ধীরগতিতে উঠে এল বেদির ওপর। সাপটা লোকটার শরীরের ওপর দিয়ে চলে যাচ্ছিল ওপাশে। ঘুমন্ত লোকটা বিরক্ত হয়ে একটা হাত তুলে সাপটাকে ঝেড়ে ফেলতে যেতেই প্রকাণ্ড সাপটা প্রকাণ্ড ফণা তুলে দাঁড়াল লোকটার বুকের ওপর। তারপর বিদ্যুৎগতিতে তার ছোবল নেমে এল লোকটার কপালে।

বাঁ হাত দিয়ে সাপের গলাটা খুব তাচ্ছিল্যের সঙ্গেই ধরল লোকটা। তারপর উঠে বসে একটা হাই তুলল। সাপটা কিলবিল করছিল তার হাতের মধ্যে। সাপটাকে দু' হাতে ধরে মন্দিরের বাইরে এসে লোকটা চারদিকে চেয়ে দেখল একটু। তারপর সাপটাকে ছেড়ে দিল সামনে। তারপর আবার একটা হাই তুলল।

এই জঙ্গলের ভয়াবহতম্ প্রাণী হচ্ছে বুনো কুকুর। ক্ষুধার্ত হিংস্র বুনো কুকুরকে বাঘও ভয় খায়। কারণ তারা একসঙ্গে পঞ্চাশ-ষাটটা করে ঘুরে বেড়ায়, সামনে যে-কোনও প্রাণীকে পেলে সবাই মিলে আক্রমণ করে কয়েক মিনিটের মধ্যে খেয়ে সাফ করে দেয়।

লোকটা বাইরে অলস ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে বুনো কুকুরদের চিৎকার শুনছিল। কুকুরের পাল এগিয়ে আসছে এদিকেই। লোকটার তাতে কোনও উদ্বেগ বা ভয় দেখা গেল না। চুপ করে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। তারপর ধীর পায়ে জঙ্গল ভেঙে এগোতে লাগল। তার শরীরের ধাক্কায় বাঁশঝোপের দু-একটা বাঁশ মচকে গেল, ছোটখাটো গাছ কাত হয়ে পড়তে লাগল।

হঠাৎ ঝোপঝাড় ভেঙে একপাল বুনো কুকুর এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর। সে তেমন ঘাবড়াল না। দুটো কুকুরকে তুলে অনেক দূরে ছুড়ে ফেলে দিল! আর বাকিগুলোকে পা দিয়ে

কয়েকটা লাথি কষাল। আশ্চর্যের বিষয়, ভয়ঙ্কর বুনো কুকুরেরা কেন যেন কিছু টের পেয়ে থমকে গেল। তারপর লোকটাকে ছেড়ে দুদ্দাড় করে পালিয়ে গেল সকলে।

জঙ্গল থেকে বেরিয়ে গাঁয়ের রাস্তায় পা দেওয়ার আগে লোকটা একটা বাঁশঝোপের পেছনে দাঁড়িয়ে চারদিকটা ভাল করে লক্ষ করল। সে লক্ষ করল গাঁয়ের এইদিকটা আজ অস্বাভাবিকভাবে জনশূন্য। সে একটু চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে বেরিয়ে এল। ধীর এবং নিশ্চিন্ত পায়ে সে হাঁটছে। চারদিকে একটু দেখে নিচ্ছে মাঝে-মাঝে। না, তাকে কেউ লক্ষ করছে না। গাঁয়ের কুকুররা তাকে দেখে তেড়ে এলেও কাছাকাছি এসেই কেন যেন ভয় পেয়ে কেঁউ-কেঁউ করে পালিয়ে যায়।

পুবপাড়া ছাড়িয়ে কেওটপাড়া। আজ সব পাড়াই জনশূন্য। রাস্তা ফাঁকা। দূরে কোথাও একটা কোলাহল শোনা যাচ্ছে। কোলাহলটা কোথা থেকে আসছে এবং কেন, তা লোকটা জানে। আজ গাঁয়ের লোক অঘোর সেনের ল্যাবরেটরি পাহারা দিতে জড়ো হয়েছে। লোকটা একটু হাসল। ওদের কাছে লাঠিসোটা আছে সে জানে।

কেওটপাড়া পার হয়ে লোকটা রাস্তা ছেড়ে আঘাটায় নেমে গেল। সামনে বনবাদাড়, ঝিল, বাঁশঝোপ, জলাজমি। কাঁটাঝোপের জঙ্গল পেরিয়ে লোকটা ঝিলের জলে অম্লানবদনে নেমে গেল। ঝিলটা সাঁতরে পার হয়ে সে বাঁশঝাড়ে ঢুকে গেল। সামনে একটা জলাজমি, তার পরেই অঘোর সেনের বাড়ি দেখা যাচ্ছে। বাড়ির চারদিকে লণ্ঠন, মশাল এবং টর্চ নিয়ে বহু মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। তারা হল্লা করছে।

লোকটা কিছুক্ষণ পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইল, তারপর বাঁশঝোপ থেকে বেরিয়ে জলাজমিতে পা রাখল। জলায় কোমর

অবধি কাদা। একবার পড়লে আর ওঠা যায় না। কিন্তু লোকটার শরীরের শক্তি যন্ত্রের মতো। সে কাদায় নেমে সেই কাদা ঠেলে এগিয়ে যেতে লাগল। কোনও অসুবিধেই হল না তার।

জলাজমির প্রান্তে হোগলার বন। লোকটা হোগলার বনে দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণ চোখে বাড়ির পেছনদিকটা লক্ষ করল। পেছনে জলাজমি বলে ওরা এদিকে পাহারা কম রেখেছে। কারণ জলাজমি দিয়ে কোনও মানুষের পক্ষে হানা দেওয়া সম্ভব নয়। পেছনে মাত্র তিনজন লোক পাহারায় আছে।

এই গ্রহের প্রাণীদের শরীর দুর্বল, প্রাণশক্তিও কম। এদের অস্ত্রশস্ত্রগুলি হাস্যকর। লোকটা ইচ্ছে করলে এদের সব ক'জনকেই ঘায়েল করে কার্যোদ্ধার করতে পারে। কত লোককে হত্যা করতে হবে তা সে জানে না। সে শুধু জানে, সব কাজেরই একটা সময় আছে।

তার চারদিকে লক্ষ-লক্ষ মশা ওড়াউড়ি করছে, গা ঘেঁষে চলে যাচ্ছে জলজ সাপ, জোঁক কিলবিল করছে চারদিকে, ব্যাঙ লাফিয়ে পড়ছে গায়ে। তার ভ্রূক্ষেপ নেই। সে হিসেব করে দেখল, আরও কয়েক ঘণ্টা পর, বিশেষ করে ভোরের দিকে এই মানুষগুলি ক্লান্ত হয়ে পড়বে। এদের ঘুম পাবে, শিথিল হয়ে যাবে সতর্কতা। এখনই সময়। সুতরাং তাকে অপেক্ষা করতে হবে। সে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

দারোগা হরকান্ত পোদ্দার রাত্তিরবেলা বিশেষ কিছু খান না। পাঁঠার কালিয়া আর ঘিয়ে ভাজা পরোটা। তা তাঁর জন্য আজ গোবিন্দ বিশ্বাসের বাড়িতে তা-ই রান্না হচ্ছে। হরকান্ত পোদ্দার বাইরে একখানা কাঠের চেয়ারে পা ছড়িয়ে বসে তাঁর দারোগা-জীবনের নানা বীরত্বের কাহিনী বর্ণনা করছেন। সবাই তটস্থ হয়ে দাঁড়িয়ে শুনছে। দু'জন বন্দুকধারী কনস্টেবল ভিড়



সামলাচ্ছে।

হরকান্ত পোদ্দার সুবুদ্ধি আর দ্বিজপদর দিকে চেয়ে বললেন, "তোমরা বলছ, লোকটার গায়ে খুব জোর ! ওরে বাবা, যত জোরই থাক ট্যারা পালোয়ানের চেয়ে তো আর সে তাকতওয়ালা লোক নয় ! মোহনপুরের জঙ্গলে সেই ডাকু ট্যারা পালোয়ানের সঙ্গে হাতাহাতি লড়াই হল সেবার। তা লড়েছিল খুব। কিন্তু পারবে কেন ? শেষে তাকে কোমরের বেল্ট দিয়ে একটা শালগাছের সঙ্গে বেঁধে ফেললাম। লোকটা সেলাম ঠুকে বলেছিল, 'আপনার মতো মস্তান দেখিনি কখনও।' নাড়ু গুণ্ডার নাম শুনেছ ? বাহাত্তর ইঞ্চি বুকের ছাতি, দু'খানা হাত ছিল এক জোড়া শাল খুঁটি, আস্ত খাসি খেয়ে ফেলত এক-একবার। সেই নাড়ুকে যখন ধরতে গেলুম তখন কী ফাইটিংটাই না হল। হিন্দি সিনেমার ফাইটিং তার কাছে নস্যি। নাড়ু স্বীকার করেছিল, 'হ্যাঁ, ওস্তাদ বটে !' বুঝেছ ?"

সুবুদ্ধি আর দ্বিজপদ ঘাড় নাড়ল বটে, কিন্তু তারা হরকান্ত দারোগার উপস্থিতিতে বিশেষ ভরসা পেয়েছে বলে মুখের ভাবে প্রকাশ পেল না। হরকান্তর চেহারা দশাসই, সন্দেহ নেই। কিন্তু অনেক তেল-ঘি, মাংস-মাছ খেয়ে চেহারাটা বড়ই বিপুল। এ-চেহারায় ফাইটিং করতে গেলে কী কাণ্ড হবে কে জানে !

সনাতন বিশ্বাস বা অঘোর সেনের ল্যাবরেটরির কথা এখনও কাউকে জানায়নি তারা। শুধু প্রচার হয়েছে একটা ডাকাত আজ হামলা করতে আসছে। নন্দপুরে বহুকাল কোনও উত্তেজক ঘটনা ঘটেনি। তাই গাঁ ঝেঁটিয়ে লোক এসেছে।

সনাতন বিশ্বাসকে গোবিন্দ তাঁর বাড়ির একেবারে অন্দরমহলে লুকিয়ে রেখেছেন। নিজের বংশধরদের মধ্যে এসে সনাতন দুঃখের মধ্যেও কিছুটা সুখ পাচ্ছেন। গোবিন্দ বিশ্বাসের বউকে তিনি বলেছেন, "বউমা, এখন একটাই অসুবিধে। দেড়শো বছর

টানা ঘুমিয়েছি, এখন কি আর আমার ঘুমটুম হবে ?”

সমাজ মিত্তির তাঁর মোটা লাঠিটা হাতে নিয়ে চারদিকে ঘুরে দেখছেন এবং লোকটা হাজির হলে কী করা হবে তার স্ট্র্যাটেজি ঠিক করছেন।

মাটির নীচে পাতালঘরে ভূতনাথ একা অবস্থান করছেন। তাঁর কপালে ভ্রূকুটি। তিনি বুঝতে পারছেন, অঘোর সেনের এই ল্যাবরেটরি দেড়শো বছর আগেকার প্রযুক্তি দিয়ে তৈরি হয়নি। এতে উন্নত বিজ্ঞানের অবদান আছে। এবং সেই বিজ্ঞান এই পৃথিবীর বিজ্ঞান নয়। হিক সাহেবের কথা তিনি শুনেছেন। বিচার-বিশ্লেষণ করে অনুমান করতে পারছেন যে, এই হিক সাহেবই সেই উন্নত বিজ্ঞানের সরবরাহকারী। আর এও বুঝতে পারছেন, যে লোকটি হামলা করছে সে এসেছে প্রমাণ লোপ করতে এবং কিছু জিনিস বা যন্ত্রপাতি ফেরত নিয়ে যেতে। সম্ভবত সে সনাতন বিশ্বাসকেও নিয়ে যাবে, যাতে পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকরা রহস্যটা ভেদ করতে না পারে।

অনেক ভেবে ভূতনাথ হতাশায় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। একটা লোক, কিন্তু সে অমিতবিক্রমশালী। তাঁরা যে পাহারা বসিয়েছেন তা দিয়ে লোকটাকে রোখা যাবে কি না সে-বিষয়ে তাঁর ঘোর সন্দেহ আছে। তিনি আজ কলকাতায় গিয়ে তাঁর রিভলভারটা নিয়ে এসেছেন, দারোগা এবং কনস্টেবলদের কাছেও বন্দুক-পিস্তল আছে। কিন্তু এগুলো তাঁর যথেষ্ট বলে মনে হচ্ছে না। তাঁর ভয় এবং দুশ্চিন্তা হচ্ছে।

ভূতনাথ ল্যাবরেটরিটা খুব ভাল করে ঘুরেফিরে দেখেছেন। শিশি-বোতলের তরল পদার্থগুলোও কিছু-কিছু পরীক্ষা করেছেন। বেশিরভাগই পরিচিত রাসায়নিক পদার্থ। তবে সনাতনের বাক্সে যে-শিশিটা রাখা আছে তার ভেতরকার দ্রব্যটা তাঁর পরিচিত

জিনিস নয়। অমৃতবিন্দুর একটা পাত্র রয়েছে, সেটাও তাঁর চেনা জিনিস নয়। তবে সবকিছুই ফের ভাল করে 'ল্যাবরেটরি টেস্ট' করা প্রয়োজন। নইলে দেড়শো বছর ধরে একটা লোককে ঘুম পাড়িয়ে রাখার রহস্যটা বোঝা যাবে না। পৃথিবীর বিজ্ঞানে এরকম ঘটনার কল্পনা করা হয় বটে, কিন্তু হাতে কলমে এমন অত্যাশ্চর্য ঘটনার প্রমাণ তো সারা দুনিয়ায় তোলপাড় ফেলে দেবে। কিন্তু সেই সুযোগ কি পাওয়া যাবে ?

অঘোর সেন এক আশ্চর্য লোক। এত বড় একটা কাজ করলেন কিন্তু এক্সপেরিমেন্টের কোনও লিখিত বিবরণ রেখে যাননি। বৈজ্ঞানিকদের ধর্ম অনুযায়ী এরকম একটা বিবরণ রেখে যাওয়া তাঁর খুবই উচিত ছিল না কি ?

"ছিলই তো !" কে যেন বলে উঠল।

ভূতনাথ গভীর চিন্তার মধ্যে বিচরণ করতে-করতে বললেন, "তা হলে লিখে রাখলেন না কেন ?"

"হিক সাহেব রাখতে দিল না যে !"

এবার ভূতনাথ একটু অবাক আর সচকিত হয়ে চারদিকে চাইলেন। ল্যাবরেটরিতে তিনি একাই আছেন। তা হলে কথাটা বলছে কে ? প্রদীপের উজ্জ্বল আলোয় চারদিকটা বেশ ফটফট করছে। তবু তিনি হাতের জোরালো টর্চটা জ্বেলে চারপাশে দেখে নিয়ে বললেন, "নাঃ, আমারই মনের ভুল।"

"ভুল নয় হে, ভুল নয়। ঠিকই শুনেছ।"

কেউ নেই, অথচ তার কথা শুনতে পাওয়া যাচ্ছে এরকম ঘটনা তাঁর জীবনে আগে কখনও ঘটেনি। তিনি একটু ভয় খেয়ে বলে উঠলেন, "আপনি কে কথা বলছেন ? কাউকে যে দেখছি না !"

"দেখতে চাও নাকি ?"

ভূতনাথ কাঁপতে-কাঁপতে বললেন, "আ-আপনি কি ভূ-ভূত ?"

গলাটা খিঁচিয়ে উঠল, "ভূত আবার কী হ্যাঁ ? বিজ্ঞান শিখেছ আর এইটে জানো না যে, সব জিনিসেরই বস্তুগত রূপান্তর হয় ?"

"আজ্ঞে, তা জানি।"

"তা হলে ভূত বলে তাচ্ছিল্য করার কী আছে ?"

"তাচ্ছিল্য করিনি তো ?"

"করেছ। তুমি ভূতটুত মানো না, আমি জানি।"

"আজ্ঞে মানছি, এখন থেকে মানছি। আপনি কে ?"

"আমিই অঘোর সেন।"

ভূতনাথ আঁ-আঁ করে অজ্ঞান হয়ে পড়তে-পড়তেও সামলে গেলেন। হাতজোড় করে বললেন, "আমার হার্ট দুর্বল। আমাকে আর ভয় দেখাবেন না।"

"তোমার মতো নাস্তিককে ভয় দেখাতে এসেছি বলে ভেবেছ নাকি ? আমার অত সময় নেই। তোমাদের বিপদ বুঝেই আসতে হল। একগাদা মর্কট মিলে ওপরে তো কীর্তনের আসর বসিয়ে ফেলেছ প্রায়। হিক সাহেবের ছেলেকে কি ওভাবে আটকানো যায় ?"

ভূতনাথ কাঁপতে-কাঁপতে বললেন, "হিক সাহেব কে ?"

"সপ্তর্ষি চেনো ?"

"যে আজ্ঞে !"

"ওই মণ্ডলেরই বাসিন্দা। অনেকদিন ধরেই যাতায়াত। ওহে বাপু, তুমি যে কেঁপে-ঝেঁপে একশা হলে। ভয় পাচ্ছ নাকি ?"

"ওই একটু।"

"তা ভয়ের কী আছে বলো তো ! টেপরেকর্ডারে, গ্রামোফোনে অন্যের গলা শোনো না ? তখন কি ভয় পাও ? অনেক মৃত গায়কের গানও তো শোনো। তখন তো ভিরমি খাও না !"

"আজ্ঞে, সে তো যন্ত্রে রেকর্ড করা থাকে।"

"কিন্তু সেও তো ভূত, নাকি ? সেও তো অতীত, যা নাকি এখন নেই। ঠিক তো !"

"আজ্ঞে।"

"ফোটো দেখো না ? ফোটোতে কত শতায়ু মানুষের ছবিও তো দেখো, তখন ভয় পাও ?"

"আজ্ঞে, সে তো ইমপ্রেশন।"

"ভাল করে বিজ্ঞানটা রপ্ত করো, তা হলে ভূতপ্রেতও বুঝতে পারবে, বুঝেছ ? এসবও ইমপ্রেশন, এসবও সূক্ষ্ম অস্তিত্ব, তবে কিনা বিজ্ঞান এখনও নাগাল পায়নি এই রহস্যের।"

"যে আজ্ঞে !"

"শোনো বাপু, একটা কথা বলতে এই এতদূর আসা। অনেক দূরে থাকি, নানা কাজকর্মও করতে হয়। পরলোক বলে বসে শুয়ে জিরিয়ে সময় কাটানোর উপায় নেই। তবু তোমাদের বিপদের খবর পেয়েই আসতে হল।"

"যে আজ্ঞে।"

"হিক সাহেবের ছেলে পেছনের জলায় ঘাপটি মেরে আছে।"

"সর্বনাশ ! তা হলে লোকজনকে খবর দিই ?"

"আহাম্মকি করতে চাইলে দিতে পারো। তবে যদি ঘটে বুদ্ধি থেকে থাকে, ও-কাজ করতে যেও না। ওর নাম ভিক। ও একাই গাঁসুদ্ধু লোককে মেরে ফেলতে পারে।"

"তা হলে কী করব ?"

গলাটা খেঁচিয়ে উঠল ফের, "তার আমি কী জানি ?"

"তবে যে বললেন, বিপদ দেখে এসেছেন !"

"তা তো এসেছিই। কিন্তু ভূত বলে কি আর আমি সবজান্তা ?"

"যে আজ্ঞে।"

"শোনো বাপু, গতিক আমি সুবিধের বুঝছি না। হিকের সঙ্গে আমার চুক্তি ছিল সনাতনের যেদিন ঘুম ভাঙবে সেদিনই সে তার 'রেসপিরেটর' আর 'রিভাইভার' যন্ত্র সমেত সনাতনকেও নিয়ে যাবে।"

"বটে ! তা হলে আমরা আপনার এত বড় আবিষ্কারের কোনও ফলই পাব না ?"

"পেয়ে করবেটা কী ? লোকে জানতে পারলেই সব ঘুমোতে চাইবে। মরার চেয়ে ঘুম যে অনেক ভাল বলে মনে করে সবাই।"

ভূতনাথ মাথা চুলকে বললেন, "তা অবশ্য ঠিক। কিন্তু আবিষ্কারটা যে মাঠে মারা যাবে।"

"তা যাবে। হিক সাহেব ছাড়বার পাত্র নন। সনাতন যে জেগেছে সে-খবর তাঁর কাছে পৌঁছে গেছে। তাই ছেলেকে পাঠিয়ে দিয়েছেন।"

"তা হলে কী করা যায় বলুন তো !"

"ভাল করে শোনো।"

"শুনছি।"

"সনাতন খুব পাজি লোক, তা জানিস ?"

"আজ্ঞে না। কীরকম পাজি ?"

"কীরকম পাজি তা বলা মুশকিল। আমিও জানি না, তবে গাঁয়ের লোক ওকে ভয় পেত।"

"যে আজ্ঞে।"

"তোমরা ওকেই কাজে লাগাও।"

"কীভাবে ?"

"তা আমি জানি না। যা মনে এল বললাম। এখন আমি যাচ্ছি। 'অ্যান্ড্রোমিডা' নক্ষত্রপুঞ্জে আমার জরুরি কাজ আছে।

সেখানে আজ আর্কিমিডিস বক্তৃতা দেবেন।"

"বলেন কী ? আর্কিমিডিস ? এ যে ভাবা যায় না !"

"না ভাববার কী আছে ! হরবখত দেখা হচ্ছে ওঁদের সঙ্গে। আর্কিমিডিস, নিউটন, গ্যালিলেও।"

"অ্যাঁ !" বলে মস্ত হাঁ করে রইলেন ভূতনাথ। তারপর হঠাৎ পকেট থেকে রিভলভারটা বের করে নিজের কপালে ঠেকিয়ে বললেন, "স্যর, একটু দাঁড়ান। আমিও আপনার সঙ্গে আর্কিমিডিসের বক্তৃতা শুনতে যাব। এ সুযোগ ছাড়া যায় না।"

"তা বলে মরবে নাকি ?"

"না মরলে তো উপায় দেখছি না। একটা মিনিট দাঁড়ান। পিস্তলের ঘোড়া টিপলেই এক মিনিটের মধ্যে বেরিয়ে আসব।"

"আ মলো ! এ তো আচ্ছা পাগল দেখছি ! ওহে বাপু, আর্কিমিডিসের বক্তৃতা মেলা শুনতে পাবে। বেঁচে থেকে যা-যা করার, ঠিকমতো আগে করো, নইলে বিজ্ঞানলোকে আসবার পাসপোর্ট হবে না যে !"

ভারী হতাশ হয়ে ভূতনাথ বললেন, "আমার যে তর সইছে না।"

"আরে বাপু, আয়ু তো দু'দিনের। তারপর হাতে দেখবে অফুরন্ত সময়। রিভলভারটা পকেটে ঢুকিয়ে ফেলো তো বাপু ! আমি চললুম।"

"যে আজ্ঞে।"

অঘোর সেন যে চলে গেলেন তা টের পেলেন ভূতনাথ। একটা শ্বাসের মতো শব্দ ঘর থেকে ফুস করে যেন বেরিয়ে গেল। ঘড়ি দেখে ভূতনাথ চমকে উঠলেন। সর্বনাশ ! পৌনে চারটে বাজে ! রাত শেষ হতে তো আর দেরি নেই !

তিনি হ্যাঁচোড়-প্যাঁচোড় করে উঠে পড়লেন। সুড়ঙ্গের মুখে



মই লাগানো হয়েছে। সেটা বেয়ে ওপরে উঠে যা দেখলেন তাতে তাঁর একগাল মাছি। বেশিরভাগ পাহারাদারই শুয়ে বা বসে গভীর নিদ্রাভিভূত। দারোগাবাবুর নাক ডাকছে। জেগে আছে, শুধু সুবুদ্ধি, সমাজ মিত্তির আর দু-চারটে লোক। তিনি চেঁচিয়ে বললেন, "শিগ্‌গির সনাতনবাবুকে ডাকো তোমরা। আর সময় নেই।"

চেঁচামেচিতে সবাই জেগে গেল। স্বয়ং গোবিন্দবাবু বেরিয়ে এসে বললেন, "কী হয়েছে ? সনাতনদাদু তো ঘুমোচ্ছেন।"

"ঘুমোচ্ছেন ! দেড়শো বছর ঘুমিয়েও আবার ঘুম ?"

"আজ্ঞে, পরোটা আর মাংস খাওয়ার পর তাঁর ভারী ঘুম পেয়ে গেল যে !"

"শিগ্‌গির তাঁকে তুলুন। নইলে রক্ষে নেই।"

অনেক ডাকাডাকির পর সনাতন উঠে বাইরে এসে হাই তুলে বললেন, "প্রাতঃকালেই ডাকাডাকি কেন হে ?"

"আজ্ঞে, আপনিই ভরসা।"

"কী করতে হবে, বলো তো বাপু ?"

"কী করতে হবে, তা জানি না। দয়া করে একটু পাতালঘরে এসে বসুন।"

"না হে বাপু, আর পাতালঘরে নয়। ওখানে গেলে যদি ফের ঘুমিয়ে পড়ি ?"

"সে-ভয় নেই। দয়া করে আসুন।"

সাড়ে তিনটের সময় যখন লোকটা দেখল পাহারা শিথিল, সবাই ঘুমে ঢুলছে, তখন সে ধীরে-ধীরে হোগলার বন ভেদ করে ওপরে উঠে এল। খুবই নিঃশব্দ তার চলাফেরা।

গাড়ির পেছনকার বাগানের পাঁচিলটা ডিঙিয়ে সে ঢুকে পড়ল

ভেতরে। তারপর ধীরে-ধীরে বাড়ির দিকে এগোতে লাগল।

হঠাৎ কে যেন চেঁচিয়ে উঠল কার নাম ধরে। অনেক লোক জেগে উঠল। পাশের বাড়ি থেকে দুটো লোক এ-বাড়িতে এসে ঢুকল। লোকটা একটু অপেক্ষা করল। গোলমালটা থিতিয়ে আসতেই সে নিঃশব্দ পদচারণায় বাড়ির পেছনের একটা দরজায় গিয়ে দাঁড়াল। হাতের সামান্য একটু কলাকৌশলেই খুলে গেল দরজা। সে ভেতরে ঢুকল।

সামনেই একটা লোক। তাকে দেখে চেঁচানোর জন্য হাঁ করেছিল। লোকটা তাকে সামান্য একটা কানা মারতেই লোকটা আলুর বস্তার মতো পড়ে গেল মেঝের ওপর।

সুড়ঙ্গর পথ তার চেনা। সে নিঃশব্দে গিয়ে গর্তটার সামনে দাঁড়াল। তারপর নামতে লাগল নীচে।

পাতালঘরের দরজাটা বন্ধ। লোকটা হাতের ধাক্কায় দরজার পাল্লা ছিটকে দিয়ে খোলা দরজায় দাঁড়াল। নীচে দুটো লোক ভীত মুখে উর্ধ্বদিকে চেয়ে আছে।

দু'জনের একজন হঠাৎ তাকে দেখে চেঁচিয়ে উঠল, "ওই... ওই হল হিকসাহেব! ও আসলে ভূত! ও কৌটোয় করে আকাশ থেকে নেমে আসে... ওরে বাবা..."

লোকটা ওপর থেকে নীচে লাফিয়ে পড়ল।

লোকটার জীবনে যা কখনও হয়নি, যে অভিজ্ঞতা তার সূদূর কল্পনারও অতীত, লাফ দেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে তাই ঘটল। মেঝের ওপর পড়তেই তার বাঁ হাঁটুটা বেকায়দায় বেঁকে গেল। তারপর মচাৎ করে একটা শব্দ। লোকটা এক অজানা ভাষায় চেঁচিয়ে উঠল, "সাব সি! সাব সি!"

তারপর যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠে বাঁ হাঁটু চেপে ধরে বসে রইল।

ভূতনাথবাবু কাঁপতে-কাঁপতে বললেন, "ভূ-ভূত হলে কি অমন

আর্তনাদ করত ? ভূত কি ব্যথা পায় ?"

সনাতন বিশ্বাস হঠাৎ বলে উঠল, "দাঁড়ান মশাই, মনে পড়েছে। ওই কোণের দিকে টেবিলে একটা শিশি আছে। হিক শিশিটা দেখে কেমন যেন ভয় পেয়ে গিয়েছিল।"

সনাতন দৌড়ে গিয়ে শিশিটা নিয়ে এল। তাতে তেলের মধ্যে ভেজানো একটা মরা তেঁতুলবিছে। অনেকে বাড়িতে রাখে।

"ওটা কী মশাই ?"

"তেতুঁলবিছে হুল দিলে এই তেল লাগালে উপকার হয়।"

"ওতে ভয় পাওয়ার কী আছে ?"

"কে জানে মশাই !"

বলে শিশিটা নিয়ে সনাতন বিশ্বাস লোকটার দিকে এগিয়ে যেতেই ভাঙা পা নিয়ে বিবর্ণ মুখে লোকটা উঠে দাঁড়িয়ে পরিষ্কার বাংলায় বলল, "খবরদার ! খবরদার ! ওটা সরিয়ে নে !"

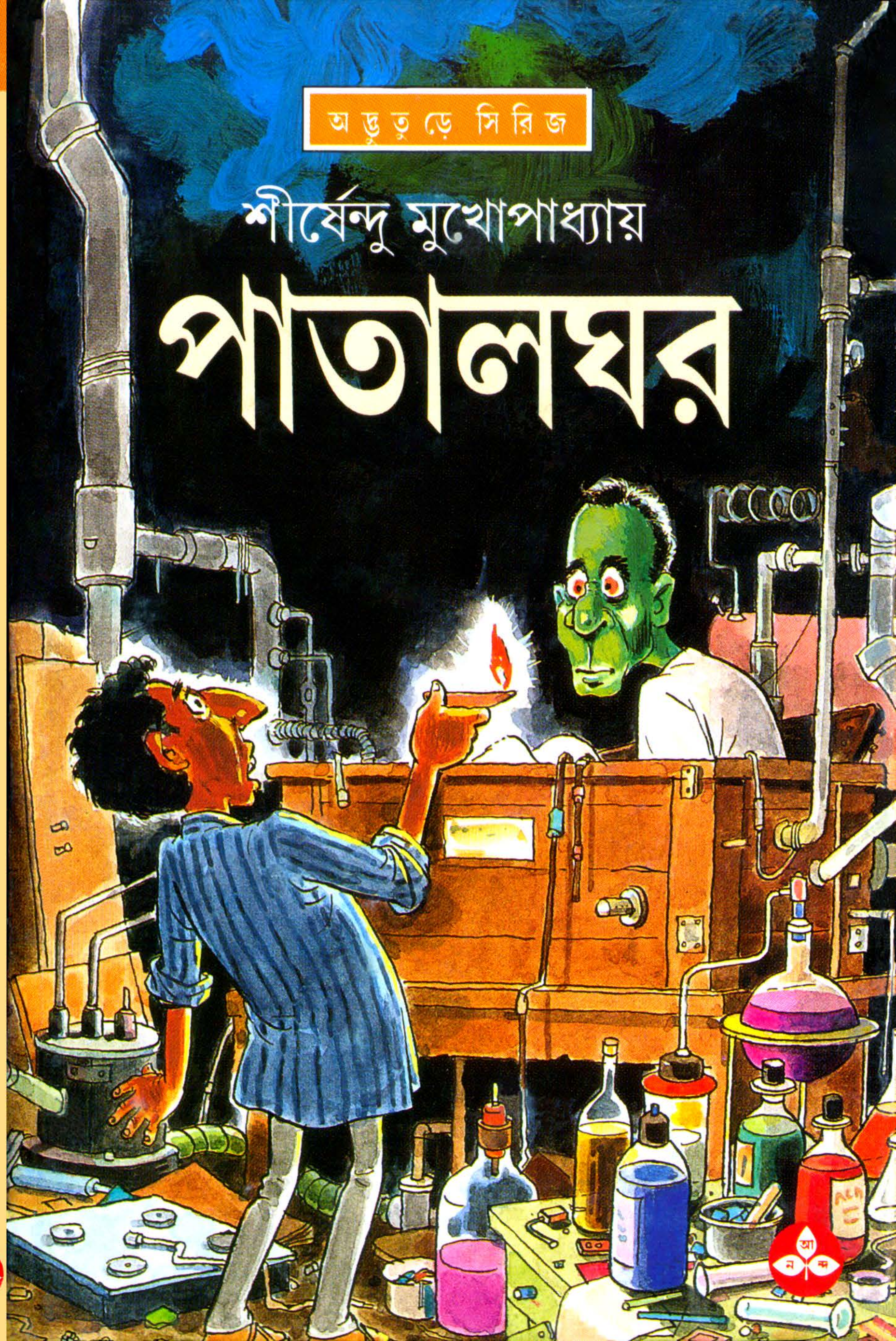
সনাতন হেঃ হেঃ করে হেসে বলল, "এবার বাছাধন ?"

লোকটা, অর্থাৎ হিকের ছেলে ভিক হঠাৎ অমানুষিক একটা চিৎকার করে এক লম্ফে ওপরের ফোকরটার কানা ধরে ঝুল খেয়ে ওপরে উঠে পড়ল। আর ঠিক সেই সময়ে ওপর থেকে একটা পাথর আলগা হয়ে খসে পড়ল তার মাথায়। তবু চেঁচাতে-চেঁচাতে লোকটা ওপরে উঠে পড়ল। সুড়ঙ্গ বেয়ে রাস্তায় নেমে ভাঙা পা নিয়েই সে এমন দৌড় লাগাল, যা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়।

সনাতন শিশিটা রেখে দিয়ে কপালের ঘাম মুছে বলল, "হুঁ, গোবিন্দ আবার অপয়া ! ছেলেমানুষ মশাই, ছেলেমানুষ। আমি এমন অপয়া ছিলাম যে, কুকুর-বেড়াল অবধি আমার পথে হাঁটত না।"

ভূতনাথ গদগদ স্বরে বললেন, "দিন মশাই, পায়ের ধুলো দিন।"


9 788172 155148



পাতালঘর • শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়